Contents

আমরা হাদীছ মানতে বাধ্য

الحديث لا بد منه

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

Contents

আমরা হাদীছ মানতে বাধ্য

الحديث لا بد منه

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
ফাযিল, দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
ছাত্র, হাদীছ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব

নিবরাস প্রকাশনী

আমরা হাদীছ মানতে বাধ্য
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

প্রকাশক
নিবরাস প্রকাশনী
নওদাপাড়া (আমচত্ত্বর), সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৯৬২-৬২২৫০৭

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ
রবীউল আওয়াল ১৪৩৮ হিজরী
পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

নির্ধারিত মূল্য : ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

Amra Hadeeth Mantey Baddho, Written by Abdullah Bin abdur razzak & Published by Nibras Prokashoni, Nawdapara, Rajshahi.Mobile : 01962-622507, Fixed price : 50 (Fifty) Taka only

সূচীপত্র

বিষয়

Contents

Contents

Contents

ভূমিকা :

সকল প্রশংসা এই নিখিল বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর জন্য। শান্তির বারিধারা বর্ষিত হোক মানবজাতির মুক্তির অগ্রদূত রাসূল (ছাঃ)-এর উপর। মানব জীবনের সকল সমস্যার যুগোপযোগী সমাধানের একমাত্র প্লাটফর্ম ইসলাম। যার মৌলিক উৎস দু'টি। কুরআন ও হাদীছ। যুগে যুগে ইসলাম বিদ্বেষীরা কুরআন-হাদীছের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা ইসলামের শক্তিশালী দূর্গকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। শক্তির দাপটে, বাহুর বলে ইসলামকে দমিয়ে না রাখতে পেরে তারা পিছন থেকে পিঠে ছুরি চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তাদের এই দূরভিসন্ধির নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছে 'হাদীছ'। ইসলামের ২য় উৎস হাদীছের ভাণ্ডারকে অকেজো ও অচল করে প্রকারান্তরে ইসলামকে অকেজো করাই তাদের এই ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য। হাদীছ বিষয়ে মুসলিমদের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য প্রাচ্যবিদ ও তাদের পা-চাটা গোলামরা সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। নাম ও সাইনবোর্ড পরিবর্তন করে পুরাতন বিষ মুসলিমদের গলাধঃকরণের অপকৌশল চালানো হচ্ছে। নতুন বোতলে পুরাতন মদ সাপ্লাই হচ্ছে।

আলহামদুলিল্লাহ যখনই হাদীছ শাস্ত্র নিয়ে ষড়যন্ত্র হয়েছে, তখনই মুহাদ্দিছগণ সেই ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটন করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। নিকট অতীতে ভারতের মাটিতে মাওলানা ইসমাঈল সালাফী, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, হাফেয যুবাইর আলী যাঈ (রহঃ) এবং আরবের মাটিতে আব্দুর রহমান ইয়াহইয়া আল-মু'আল্লিমী, আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী, শায়খ আহমাদ শাকির (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ বিভিন্ন অপবাদ, বিভ্রাট, সংশয় ও অভিযোগ থেকে হাদীছের পবিত্র আঁচলকে রক্ষার পিছনে যারপর নেই ভূমিকা পালন করেছেন।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ কিতাব আমাদের চোখে পড়েনি। যোগ্যতার অভাব থাকলেও হাদীছের প্রতি ভালবাসা থেকেই মুহাদ্দিছগণের অনুসরণে এ বইটি লেখার কাজে হাত দিই। যুগের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী এ বইয়ে বিভিন্নভাবে হাদীছ অস্বীকারকারীদের উদ্ভট যুক্তি এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিভ্রাটের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলিম উম্মাহকে জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে তাদের মুক্তি ও নাজাতের একমাত্র পথ।
মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন তার রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের হেফাযতে এই সামান্য পরিশ্রমটুকু কবুল করেন! এর দ্বারা ঐ সমস্ত ভাইদের হেদায়াত দান করেন, যারা যুক্তির মারপ্যাঁচে হাদীছে রাসূলকে অস্বীকার করার মত জঘন্য গুণাহে লিপ্ত। সর্বোপরি আমার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পরিবার-পরিজন সকলকে তার দ্বীনের খাদেম হিসেবে কবুল করেন- আমীন! ছুম্মা আমীন!

হাদীছ অস্বীকারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

الْحَسَنُ قَالَ بَيْنَمَا عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ يُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا نُجَيْدٍ حَدِّثْنَا بِالْقُرْآنِ فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أَرَأَيْتَ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ أَكُنْتُمْ مُحَدِّثِي كَمِ الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَأَصْنَافِ الْمَالِ؟ ثُمَّ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الزَّكَاةِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا أَبَا نُجَيْدٍ أَحْيَيْتَنِي أَحْيَاكَ اللهُ ثُمَّ قَالَ الْحَسَنُ فَمَا مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ حَتَّى كَانَ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

‘হাসান বলেন, একদা ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে আমাদেরকে হাদীছ শুনাচ্ছিলেন। তখন তাকে এক ব্যক্তি বলল, হে আবু নুজাইদ! আমাদেরকে কুরআন শুনাও! তখন ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) বললেন, তুমি কি মনে কর তুমি এবং তোমার সাথীরা কুরআন পড়ে আমাকে স্বর্ণ, উট, গরু ও সম্পদের যাকাতের পরিমাণ জানাতে পারবে? অতঃপর ইমরান (রাঃ) বললেন, নিশ্চয় রাসূল (ছাঃ) যাকাতে এই এই ফরয করেছেন। তখন সে ব্যক্তিটি বলল, হে আবু নুজাইদ! তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ, আল্লাহ তোমাকে বাঁচাক’।[১]

তাহক্বীক্ব : এ হাদীছে হাসান বাছরী (রাঃ) ইমরান হুছাইন (রাঃ) থেকে শ্রবণের বিষয়ে ‘স্পষ্ট শব্দ’ ব্যবহার করেছেন। সুতরাং এর সনদ (متصل) সংযুক্ত। এর সকল রাবী ‘মযবূত্ব’ (ثقة)।

عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

উমাইয়া ইবনে আব্দুল্লাহ একদা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, আমরা মুক্বীম অবস্থার ছালাত ও ভীতিকর পরিস্থিতির ছালাত (صلاة الخوف) কুরআনে পাই, কিন্তু সফরের ছালাতের কথা কুরআনে পাই না। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হে আমার ভাতিজা! মহান আল্লাহ আমাদের নিকট মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন, যখন আমরা কিছুই জানতাম না। আমরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে যে কাজ যেমনভাবে করতে দেখেছি ঠিক তাই করি।[২]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটির সকল রাবী ‘মযবূত্ব’ (ثقة) আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর ব্যতীত। তিনি হাসান পর্যায়ের রাবী।

১. আল-মু‘জামুল কাবীর হা/৩৬৯; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৩৭২।
২. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৯৪৬; মুস্তাদরাকে হাকিম হা/৯৪৬।

এ ঘটনা দু'টি প্রমাণ করে যে, খোদ ছাহাবায়ে কেরামের যুগেই এমন কিছু অজ্ঞ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল, যারা শুধু কুরআন যথেষ্ট এই সন্দেহে পতিত হয়েছিল। সময় যত গড়িয়েছে, এই ফিতনা তত বিস্তার লাভ করেছে। তাইতো আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী (রহঃ) বলেন,

عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِذَا حَدَّثْتَ الرَّجُلَ بِالسُّنَّةِ فَقَالَ دَعْنَا مِنْ هَذَا وَحَدِّثْنَا مِنَ الْقُرْآنِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ ضَالٌّ مُضِلٌّ

আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী (রহঃ) বলেন, যখন তুমি কাউকে হাদীছ শুনাও এবং সে বলে যে, ছাড়ো এসব! আমাদেরকে কুরআন শুনাও, তখন জেনো যে, সে নিজে পথভ্রষ্ট এবং অন্যকে পথভ্রষ্টকারী।[৩]

তাহক্বীক্ব : এ হাদীছের সকল রাবী মযবূত্ব (ثقة)।

উছমান (রাঃ)-এর হত্যার পর সমগ্র ইসলামী খিলাফতে ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে। এই ফিতনায় খারেজী ও শী'আ ফিরক্বাদ্বয়ের আবির্ভাব ঘটে, যার প্রভাব হাদীছের উপর পড়তে শুরু করে। শী'আরা শুধুমাত্র আহলে বায়াতের হাদীছ গ্রহণ করা শুরু করে। খারেজীরা যে সমস্ত ছাহাবীকে কাফের মনে করত, তাদের হাদীছ গ্রহণ করা ছেড়ে দেয়। হাদীছ অস্বীকার করার এ ফিতনা সবচেয়ে বিস্তার লাভ করে মু'তাযিলা ফিরক্বার মাধ্যমে। তারা হাদীছের উপর বিবেককে প্রাধান্য দেয়া শুরু করে। এমনকি 'খবারে ওয়াহেদ'ও (خبر واحد) তাদের নিকট দলীলযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য যে, ড. মুছত্বফা আল-আ'যমী তার 'দিরাসাত ফিল হাদীছ আন-নাবাবী' (دراسات في الحديث النبوي) বইয়ে বর্ণনা করেন যে, ইসলামের কোন ফিরক্বাই সরাসরি হাদীছ অস্বীকার করেনি। ইসলামী শরী'আতের ২য় উৎস হিসাবে হাদীছ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তারা নিজেদের মত ও মাযহাব বিরোধী হাদীছগুলো বাতিল করার জন্য বিভিন্ন অসৎ পন্থা ও মূলনীতি অবলম্বন করে! সম্পূর্ণরূপে হাদীছ অস্বীকার করার দুই একটা উদাহরণ কাকতালীয়ভাবে পাওয়া গেলেও তা ৩য় শতাব্দীকাল আসতে আসতে শেষ হয়ে যায়। হাদীছ সরাসরি অস্বীকার করার ফিতনা ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিগত কয়েক শতাব্দীতে জন্ম নেয়।[৪]

৩. খত্বীব বাগদাদী, আল-কিফায়া ১/১৬।
৪. মুছত্বফা আল-আ'যমী, দিরাসাত ফিল হাদীছ আন-নাবাবী ২২-২৫।

আধুনিক যুগে হাদীছ অস্বীকার

আধুনিক যুগে হাদীছ অস্বীকার মূলতঃ প্রাচ্যবিদদের (Orientalist) দ্বারা প্রভাবিত একদল মুসলিম স্কলারের হাতে হয়। যার কেন্দ্র বলা যায় ভারত ও মিসর। মিশরের মুফতী আবদুহু, সৈয়দ রশীদ রিযা, ড. আহমাদ আমীন ও মাহমূদ আবু রাইয়ার হাতে এ ফিতনা অঙ্কুরিত হয়। এদের মধ্যে মাহমুদ আবু রাইয়ার আক্রমণ সবচেয়ে নিকৃষ্ট ছিল। সে তার 'আযওয়া আলাস-সুন্নাহ' (أضواء علي السنة) বইয়ে ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) ও হাদীছে রাসূল বিষয়ে বিষোদগার করেছে। সৈয়দ রশীদ রিযা আল্লাহর অশেষ রহমতে তার পূর্বের অবস্থান থেকে ফিরে আসেন এবং তার হাদীছ বিরোধী 'আল-মানার' (المنار) পত্রিকা হাদীছের পক্ষে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

ড. আহমাদ আমীন 'ফাজরুল ইসলাম' (فجرالاسلام) 'যুহাল ইসলাম' (ضحي الاسلام) ও 'যুহরুল ইসলাম' (ظهرالاسلام) এই তিনটি বইয়ে হাদীছে সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। আরব বিশ্বের নামকরা সাহিত্যিকদের মধ্যে ইসলামের ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে যে সবচাইতে নগ্ন হামলা চালিয়েছে, তিনি হলেন মিসরের অন্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক ড. ত্বহা হুসাইন। রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ উম্মাহাতুল মুমিনীনের উপর নির্লজ্জের মত হামলা চালিয়েছেন তিনি।

অন্য দিকে ভারতে 'আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়'-এর প্রতিষ্ঠাতা ইংরেজ কর্তৃক 'স্যার' উপাধিপ্রাপ্ত সৈয়দ আহমাদ খান এই ফিৎনার উত্থান ঘটান। তিনি কুরআন-হাদীছের চাইতে মানতিক্ব ও যুক্তিবাদের উপরে অধিক নির্ভর করেছেন। তার লিখিত তাফসীর গ্রন্থে তিনি মু'জিযা সংক্রান্ত ঘটনাগুলোকে অস্বীকার করতঃ সেগুলোর তা'বীল করেছেন। তারই পদাংক অনুসরণ করে মৌলবী চেরাগ আলী, আব্দুল্লাহ চকড়ালবীসহ আরো অনেকে। সাথে সাথে সৈয়দ রশীদ রিযার মত ইসলামের হিতাকাংখী একদল স্কলার রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ নিয়ে সংশয়ে ভুগতে থাকেন। তাদের কিতাবে হাদীছ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। বর্তমানে হাদীছ অস্বীকার নামক ভয়ানক ফিতনার অন্যতম একটা অংশ হল নাস্তিকতা। তথাকথিত যুক্তি ও বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে হাদীছকে পরীক্ষা করতে গিয়ে মুহাদ্দিছগণ ও ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিশেষতঃ আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে ঠাট্টা করার মাধ্যমে এই যাত্রা শুরু হয়; এক পর্যায়ে সেই ঠাট্টা সরাসরি হাদীছ ও রাসূলকে নিয়ে শুরু হয়ে যায়। ওয়াল ইয়াযু বিল্লাহ।

হাদীছ অস্বীকারের স্বরূপ

হাদীছকে ইসলামের শত্রুরা যেমন সরাসরি অস্বীকার করেছে, তেমনি ইসলামের নামে বিপ্লব সৃষ্টিকারীদের যবান ও কলম থেকেও হাদীছের পবিত্র আঁচল রক্ষা পায়নি। নামধারী কিছু মুসলিম ছলেবলে-কৌশলে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার রাস্তা উন্মুক্ত করেছে। তাদের কিছু অপকৌশল নিম্নে পেশ করা হল:

(ক) মুতাওয়াতির হাদীছ ব্যতিত সব হাদীছ বিশেষ করে 'খবারে ওয়াহিদ' (خبر واحد) কে দলীলযোগ্য মনে না করা।

(খ) হাদীছ তাহক্বীক্বের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছগণ যেসব উছূল বা মূলনীতি অবলম্বন করেছেন, সেগুলিকে অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করা।

(গ) নিজের খোঁড়া যুক্তি, বুদ্ধি-বিবেক ও ক্বিয়াসকে হাদীছের উপর প্রাধান্য দেওয়া।

(ঘ) হাদীছ এবং সুন্নাতের মাঝে পার্থক্য করা।

(ঙ) সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যা থেকে সরে গিয়ে হাদীছের এমনভাবে তা'বীল বা দূরতম ব্যাখ্যা করা, যাতে হাদীছের আসল উদ্দেশ্যই হারিয়ে যায়।

(চ) বিভিন্ন মূলনীতির বেড়াজালে ফেলে হাদীছকে অচল ও অকেজো করে দেয়া।

এছাড়া আরো অনেক অপকৌশল অবলম্বন করে বিভিন্ন সময় নামধারী অনেক মুসলিম আমাদের প্রাণপ্রিয় মহান রাসুল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত বাণীকে অমান্য করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে ।

হাদীছ অস্বীকারকারীদের দলীল

পবিত্র কুরআনেই সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে, এই কথার দ্বারা দলীল সব্যস্ত করে একদল নামধারী মুসলিম হাদীছ অস্বীকার করে থাকে। তারা বলে পবিত্র কুরআন থাকতে হাদীছের কোন প্রয়োজন নেই। তাদের দলীল হল-

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ.

'আমরা এ গ্রন্থে কোন অসম্পূর্ণতা রাখিনি' *(আল-আন'আম ৩৮)*।
তিনি আরো বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ.

'আমরা এ গ্রন্থ আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি সকল কিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা স্বরূপ' *(আন-নাহল ৮৯)*।

এ আয়াত দু'টি থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র কুরআনেই সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে। অতএব, হাদীছের কোন প্রয়োজন নেই। নিম্নে আমরা এ অভিযোগের জবাব কয়েকটি পয়েন্টের অধীনে প্রদান করব ইনশাআল্লাহ।

আয়াতের তাফসীরে বিকৃতি :

প্রথম আয়াতটির পূর্ণরূপ হচ্ছে,
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ.

অর্থাৎ 'যমীনে বিচরণকারী সকল প্রাণী, দুই ডানা দিয়ে আসমানে উড়ন্ত পাখ-পাখালী তোমাদের মতই উম্মত। আমরা কিতাবে কোন অসম্পূর্ণতা রাখিনি। অতঃপর তাদের সকলকে তাদের প্রতিপালকের নিকট একত্রিত করা হবে' *(আন'আম ৩৮)*।

আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, পবিত্র কুরআনে সবকিছুর খুঁটিনাটি বিবরণ নেই। সুতরাং এখানে কিতাব দ্বারা অবশ্যই অন্য কিছু উদ্দেশ্য। কুরআনের মুফাসসির আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে উত্তম সানাদে ইবনু আবি হাতিম ও ইমাম তাবারী নকল করেন, তিনি বলেন, এই আয়াতে কিতাব দ্বারা লাওহে মাহফুয (لوح محفوظ) উদ্দেশ্য।[৫]

আর সত্যি বলতে কি! কুরআন তো সবকিছুর জন্য অবতীর্ণ হয়নি। কুরআন ইতিহাস গ্রন্থ নয় যে, তাতে সকল জাতি ইতিহাস থাকবে। কুরআন ভূগোলের কোন কিতাব নয় যে, সেখানে ভৌগলিক সব তথ্য থাকবে। কুরআন বিজ্ঞানের কোন কিতাব নয় যে, সেখানে বিজ্ঞানের সব থিউরী থাকবে। কুরআন গল্পের কোন গ্রন্থ নয়, আবার কোন কবিতার গ্রন্থও নয়। কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যা মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে। একজন ব্যক্তিকে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে পরিচয় করানো এবং সঠিক পথ দেখিয়ে দেওয়াই কুরআনের দায়িত্ব। এজন্য কুরআন সর্বকালের সর্বোন্নত মানের সাহিত্যিক ভাষা ব্যবহার করে কখনো ইতিহাসের তথ্য পেশ করেছে, কখনো ভূগোলের আবার কখনো বায়োলজির, আবার কখনও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার। কুরআনে যা পেশ করা হয়েছে, তার সবকিছুর মধ্যেই মানুষের জন্য শিক্ষার আলো ও পথের দিশা রয়েছে।

অন্যদিকে লাওহে মাহফূয (لوح محفوظ) এমন একটি কিতাব, যেখানে মহান আল্লাহ সবকিছু লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এরশাদ হচ্ছে,
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
'আর প্রতিটি পাতা ঝরে পড়ার ইলম মহান আল্লাহর নিকটে রয়েছে। এমনকি দুনিয়ার অন্ধকারে পতিত ক্ষুদ্র শস্যদানার ইলমও তাঁর কাছে

৫. তাফসীরে ত্বাবারী ১১/৩৪৬; তাফসীরে ইবনু আবি হাতিম হা/৭২৫৯।

রয়েছে। অনুরূপভাবে কোন আর্দ্র বা শুষ্ক দ্রব্য পতিত হলে তাও কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে' *(আল-আন'আম ৫৯)*।

দ্বিতীয় আয়াতটির পূর্ণরূপ হচ্ছে:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.

'আর সেই দিন আমি প্রতিটি উম্মতের বিপক্ষে তাদের মধ্য থেকে সাক্ষী পেশ করব এবং আপনাকে এদের ব্যাপারে সাক্ষী হিসাবে পেশ করব। আর আমি আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি এমন কিতাব, যা সকল কিছুর বর্ণনা, মুসলিমদের জন্য পথ-প্রদর্শক, রহমত ও সুসংবাদ স্বরূপ' *(আন-নাহল ৮৯)*।

এ আয়াতে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। (১) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আমাদের ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে উত্থাপন করা হবে। এই আয়াতে কুরআনকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করার কথা বলা হয়নি। কেন স্বয়ং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হবে? কেননা তাঁকে আমাদের মাঝে অনুসরণীয় করে পাঠানো হয়েছিল। তিনি আমাদেরকে তাঁর ২৩ বছরের জীবনে তাঁর কথা ও কর্ম দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শরী'আত বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি বিষয় আমাদের জন্য অনুকরণীয়। তাঁর সেই ২৩ বছরের কথা ও কাজ আজও হাদীছ হিসেবে আমাদের সামনে সংরক্ষিত। তারপরেও কেন আমরা তাকে অনুসরণ করিনি? সুতরাং এ আয়াত হাদীছ অস্বীকারের দলীল নয়; বরং হাদীছ অনুসরণের দলীল। ২. এই আয়াতে মহান আল্লাহ কুরআনকে সবকিছুর বিবরণ হিসাবে আখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি হেদায়াতস্বরূপ বলেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার সবকিছুই কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে।

মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান কুরআনে আছে

বাস্তবেই কুরআনে মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে। কুরআনেই মহান আল্লাহ মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধানের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণকে আমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের অগণিত জায়গায় এ নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর জীবনকে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ বলেছেন। সুতরাং কুরআন মানব জাতির যে সকল সমস্যার সমাধানগুলো দিয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম একটি সমাধান হচ্ছে রাসূলকে অনুসরণ করা। অতএব, কুরআন তার দাবীতে মিথ্যা নয়।

হাদীছের অস্তিত্বহীনতাই কুরআনের অস্তিত্বহীনতা

ছাহাবায়ে কেরাম হাদীছ এবং কুরআন উভয়টিই রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে পেয়েছেন। তাঁদের নিকট কুরআন ও হাদীছের জন্য আলাদা দু'জন রাসূল প্রেরণ করা হয়নি যে, একজন কুরআন শুনাবেন আর অন্যজন হাদীছ শুনাবেন। কুরআন এবং হাদীছ উভয়টিই একজনের মুখ থেকে নির্গত। স্বভাবতই প্রশ্ন

উত্থিত হয় ছাহাবায়ে কেরাম কিভাবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতেন? রাসূল (ছাঃ)-এর মুখ থেকে নির্গত কোন্ বাক্যটি কুরআন আর কোন্ বাক্যটি হাদীছ এটা তারা কিভাবে বুঝতেন?

সত্যি বলতে কি, হাদীছ ও কুরআনের মধ্যে স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) পার্থক্য করে দিতেন এবং এটাই স্বাভাবিক। রাসূল যখন ছাহাবীগণকে ডেকে বলতেন, কুরআনের উমুক উমুক আয়াত নাযিল হলো এবং অহী লেখকদের বলতেন, এটা উমুক সূরার অধীনে উমুক নাম্বার আয়াত হিসেবে সংযোজন কর, তখন ছাহাবীগণ বুঝতেন এটা কুরআন।

আমরা জানি, কুরআন ব্যতীত রাসূল (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত সবকিছুই হাদীছ। সুতরাং কুরআন এবং হাদীছের মাঝে পার্থক্য করার জন্য রাসূল যে বাক্য ব্যবহার করেছেন, তাও হাদীছ। অতএব, কেউ যদি হাদীছ অস্বীকার করে, তাহলে তাকে কুরআনও অস্বীকার করতে হবে। শুধু তাই নয়, যারা শুধু কুরআন মানতে চায়, তারা কিভাবে জানল যে, কুরআন আল্লাহর কালাম?! একমাত্র জবাব, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন তাই। তিনি কুরআনকে আল্লাহর অহী বলেছেন। আমরা বিশ্বাস করেছি। তার এই বলাটা অবশ্যই হাদীছ। সুতরাং কুরআনকে আল্লাহর কালাম প্রমাণিত করা অসম্ভব হাদীছের সহযোগিতা ছাড়া। কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপনের পূর্বে বাধ্যগতভাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কথা তথা হাদীছের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। অন্যথায় কুরআনকেও কুরআন হিসাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

সুতরাং, এ কথা স্পষ্ট যে, হাদীছের অস্তিত্বহীনতাই কুরআনের অস্তিত্বহীনতা। তাই, যে হাদীছ অস্বীকার করল সে কুরআনও অস্বীকার করল।

কুরআন শিখাবে কে?

মহান আল্লাহ কুরআন কেন অবতীর্ণ করেছেন? রাসূলকে কেন পাঠিয়েছেন? মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কাজ কি ছিল শুধু কুরআন তিলাওয়াত করে ছাহাবীগণকে শুনানো? মহান আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য কি শুধু কুরআন অবতীর্ণ করে দেয়া ছিল? যদি মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য তাই হত, তাহলে তিনি আসমান থেকে কুরআন ফেলে দিতে পারতেন। কোন ফেরেশতার মাধ্যমে সরাসরি লিখিত আকারে জনতার কাছে পাঠাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি একজন মানুষ পাঠিয়েছেন। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ ২৩ বছর ধারাবাহিকভাবে ও ঘটনাক্রমে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং বাস্তবতা এটাই যে, রাসূলের কাজ শুধু কুরআন তিলাওয়াত করে ছাহাবীগণকে শুনিয়ে দেয়া ছিল না। বরং তা পুরোপুরি বুঝানোও ছিল তাঁর গুরু দায়িত্ব। তাইতো মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ 'অতঃপর কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের উপর' *(আল- ক্বিয়ামাহ ১৯)*।

সূরা ক্বিয়ামার ১৭ থেকে ১৯ নং আয়াতে মহান আল্লাহ স্পষ্ট করেছেন যে, কুরআন এবং কুরআনের ব্যাখ্যা দুটো আলাদা জিনিস। মহান আল্লাহ যেমন কুরআন রাসূল (ছাঃ)-এর উপর নাযিল করেছেন, তেমনি তার ব্যাখ্যাও রাসূলকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

'আর আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি যিকর। যাতে করে আপনি তা মানুষদেরকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দিতে পারেন এবং তারা চিন্তাশীল হয়' *(আন-নাহল ৪৪)।*

সম্মানিত পাঠক! এ আয়াত নিয়ে যদি একটু গভীরভাবে ভাবা যায়, তাহলে বুঝা যাবে যে, মহান আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করাকে সম্বন্ধিত করেছেন নিজের দিকে এবং তা ব্যাখ্যা করে দেয়াকে রাসূলের দিকে।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.

'আমি তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাতে করে তিনি তোমাদের মাঝে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করেন। আর তোমাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত' *(আল-বাক্বারা ১৫১)।*

এ আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দু'টি বিষয় শিখানোর কথা বলা হয়েছে: (১) কিতাবুল্লাহ বা কুরআন । (২) হিকমাত ।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা আমাদের সামনে কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু হিকমাত কোথায়? তাহলে কি রাসূল (ছাঃ) তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন নি? না'ঊযুবিল্লাহ! আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর ইতিহাসের দিকে দেখলে দেখতে পাই, তিনি কুরআন ব্যতীত শুধুমাত্র একটি বিষয়ই ছেড়ে গেছেন; আর তা হচ্ছে, হাদীছ। সুতরাং এটা নিশ্চিত যে, এই হাদীছই কুরআনে বর্ণিত সেই হিকমাত। যেমনটা ইমাম কাতাদা (রহঃ) হিকমাতের ব্যাখ্যায় বলেছেন।[৬] ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) মুনকিরীনেহাদীছগণের বিরুদ্ধে তার কিতাবুর রিসালায় (كتاب الرسالة) এই দলীলটিই পেশ করেছেন।[৭]

তাইতো রাসূল (ছাঃ) বলেন,

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

৬. তাফসীরে ত্বাবারী ৩/৮৭।
৭. কিতাবুর রিসালা ১/৩২।

'মিক্বদাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সাবধান! নিশ্চয় আমাকে কুরআন এবং কুরআনের মত আরেকটা বস্তু দেয়া হয়েছে'।[৮]

এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, রাসুল (ছাঃ)-কে শুধু কুরআন দেয়া হয়েছিল এমনটি নয়; বরং তার সাথে কুরআনের মতই আরেকটি হেদায়াতের বাতি প্রদান করা হয়েছিল, যাকে পবিত্র কুরআনে হিকমাত বলা হয়েছে।

অতএব, মহান আল্লাহ যদি ছাহাবীগণকে রাসূল (ছাঃ)-এর দ্বারা কুরআন শিখানোর প্রয়োজন মনে করে থাকেন, তাহলে সেই প্রয়োজন ততদিন বাক্বী থাকবে, যতদিন এই কুরআন থাকবে। রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে কুরআনের যে ব্যাখ্যা শিখিয়েছিলেন, আল্লাহ প্রদত্ত সেই 'হিকমাত' তথা হাদীছ ক্বিয়ামত পর্যন্ত অক্ষত থাকা চাই। নইলে যেদিন রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছে, সেদিন তার সাথে কুরআনেরও মৃত্যু হয়ে গেছে! না'ঊযুবিল্লাহ!

হাদীছ ছাড়া কুরআন অসম্পূর্ণ

হাদীছ ছাড়া শুধু কুরআন দিয়ে ইসলাম মানা আকাশকুসুম কল্পনার শামিল এবং বোকামী বৈ কিছুই নয়। নিম্নে এ বিষয়ে কিছু উদাহরণ পেশ করা হল-

উদাহরণ-১

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ 'তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে মৃত এবং রক্ত' *(আল-মায়েদা ৩)*।

এ আয়াত প্রমাণ করছে যে, প্রতিটি মৃত প্রাণী হারাম এবং যাবতীয় রক্ত হারাম। অথচ আমরা মৃত মাছ খাই এবং কলিজা খাই, যা রক্ত পিণ্ড। কেননা কুরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল (ছাঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, আমাদের জন্য দু'টি মৃত প্রাণী হালাল করা হয়েছে এবং দু'টি রক্ত পিণ্ড হালাল করা হয়েছে। মৃত প্রাণী দু'টি হচ্ছে, মাছ এবং টিড্ডি বা ফড়িং জাতীয় প্রাণী। আর রক্ত পিণ্ড দু'টি হচ্ছে, কলিজা ও হৃৎপিণ্ড'।[৯]

সুতরাং হাদীছ ব্যতীত শুধু কুরআন মানতে গেলে মৃত মাছ ও কলিজা খাওয়া হারাম হয়ে যাবে। যারা হাদীছ মানতে চান না, তারা মরা মাছ এবং কলিজা খাওয়া ছেড়েছেন কি?!

উদাহরণ-২

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

৮. মুসনাদে আহমাদ হা/ ১৭১৭৪।
৯. ইবনু মাজাহ হা/৩৩১৪।

'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে জুম'আর দিন ছালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা মহান আল্লাহর যিকরের দিকে ধাবিত হও এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ কর! এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝতে' *(আল-জুম'আ ১১)।*

প্রশ্ন হচ্ছে, এ আয়াতে জুম'আর দিনের যে ছালাতের কথা বলা হয়েছে, সেটা কোন্ ছালাত? এই ছালাত কখন অনুষ্ঠিত হবে? এই ছালাতের জন্য যে ডাকার কথা বলা হয়েছে, কোন্ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে সেই ডাক দেওয়া হবে? যে ছালাতের জন্য ডাকা হবে, তা কিভাবে আদায় করা হবে?

কুরআনের এ আয়াতের উপর পূর্ণাঙ্গ আমলের জন্য হাদীছের শরণাপন্ন হওয়া একান্তই যরূরী, এর বিকল্প কোন পথ নেই। শুধু কুরআন মানার মিথ্যা দাবীদাররা! উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর কুরআন থেকে দিতে পারবেন কি? জুম'আর দিনে কখনও শুধু কুরআনের আলোকে উক্ত আয়াতের উপর আমল করেছেন কি?

উদাহরণ-৩

মহান আল্লাহ বলেন, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا 'আর পুরুষ চোর ও মহিলা চোরের হাত কেটে নাও' *(আল-মায়েদা ৩৮)*।

এ আয়াতে মহান আল্লাহ চোরের হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছেন । কিন্তু চোরের হাত কতখানি কাটা হবে? সম্পূর্ণ হাত? কনুই পর্যন্ত? কব্জি পর্যন্ত, না কোন্ পর্যন্ত? এ আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের ব্যাখ্যার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

উদাহরণ-৪

মহান আল্লাহ বলেন, لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى 'নিশ্চয় যে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে তাক্বওয়ার উপর' *(আত-তাওবা ১০৮)*।

এ আয়াতে কোন মসজিদের নাম নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বলে দিয়েছেন সেটা কোন মসজিদ। তিনি বলেন, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هُوَ مَسْجِدِي هَذَا 'সেটা হচ্ছে, আমার এই মসজিদ' (মসজিদে নববী)।[১০]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি ছহীহ ।

জানি না 'আহলে কুরআন' নামের ভ্রান্ত ফের্কার ধ্বজাধারীরা হাদীছের শরণাপন্ন না হলে উক্ত আয়াতে মসজিদ বলতে কোন্ মসজিদ বুঝবেন। তাদের মহল্লার মসজিদ নয়তো?!

১০. তিরমিযী হা/৩০৯৯।

এরকম শত উদাহরণ আছে পবিত্র কুরআনে। পবিত্র কুরআন ও রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ একে অপরের পরিপূরক। একটা ছাড়া আরেকটা অপূর্ণাঙ্গ এবং অচল। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কুরআন হচ্ছে মূল টেক্সট এবং হাদীছ তার ভাষ্য বা ব্যাখ্যা।

হাদীছ ছাড়া ইসলামী শরী‘আত অচল

ইসলামী শরী‘আতে হাদীছের ভূমিকা স্বাধীন। ইসলামে এমন অনেক হুকুম আছে যেগুলো কুরআন নয়, হাদীছ প্রণয়ন করেছে। নিম্নে কিছু উদাহরণ পেশ করা হল:

(ক) মানুষের জীবনের একটি বিরাট অংশ মুমূর্ষু অবস্থা থেকে কবর পর্যন্ত, কাফন-দাফন ও জানাযার ছালাত বিষয়ক যাবতীয় দিক-নির্দেশনা কেবলমাত্র হাদীছ দিয়েছে।

(খ) পালিত গাধা হাদীছ হারাম করেছে।[১১]

(গ) রমযানের পরে এক ছা‘ পরিমাণ যাকাতুল ফিতর হাদীছ ফরয করেছে।[১২]

(ঘ) হাদীছ সব ধরনের হিংস্র প্রাণী খাওয়া হারাম করেছে।[১৩]

(ঙ) নিজ স্ত্রীর ফুফু এবং খালার সাথে বিবাহ হারাম করেছে হাদীছ।[১৪]

এরকম অগণিত হুকুম-আহকাম আছে, যেগুলো প্রণয়নে হাদীছ স্বাধীন এবং আমরা তা মানতে বাধ্য। এজন্যই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ.

‘নিশ্চয়ই রাসূল (ছাঃ)-এর হারামকৃত বিষয় আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বিষয়ের মতই’।[১৫]

তাহক্বীক : সনদ ছহীহ।

অতএব, একথা স্পষ্ট যে কুরআন এবং হাদীছ একই পাখির দুই ডানার মত। একটা কেটে দিলে আরেকটা দিয়ে কখনই উড়া সম্ভব নয় ।

১১. বুখারী হা/২৯৯১; মুসলিম হা/১৯৪০।
১২. বুখারী হা/১৫০৩।
১৩. মুসলিম হা/১৯৩৪।
১৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; বুখারী হা/৫১০৯।
১৫. ইবনু মাজাহ হা/১২।

হাদীছ সংকলন সংক্রান্ত অভিযোগ এবং তার জবাব

- কুরআন যেভাবে লেখা হয়েছে, হাদীছ কেন সেভাবে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা হল না?
- রাসূল (ছাঃ) হাদীছ লিখতে নিষেধ করেছেন, হাদীছ যদি শরী'আতের দলীল হত, তাহলে রাসূল (ছঃ) তা লিখতে নিষেধ করতেন না; বরং লেখার জন্য উৎসাহিত করতেন।
- খোলাফায়ে রাশেদীন কেন হাদীছ জমা করলেন না?
- এত দিন পর জমা হওয়া হাদীছ কিভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ হতে পারে?

সংরক্ষণের ভিত্তি লেখা নয়, মুখস্থ শক্তি

কুরআন এবং হাদীছ এই দু'প্রকার অহীরই সংরক্ষণের ভিত্তি ছিল মুখস্থের উপর, লেখার উপরে নয়। যদি কুরআন সংরক্ষণের ভিত্তি লিখে রাখার উপর হত, তাহলে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় পূর্ণাঙ্গ কুরআন লিপিবদ্ধরূপে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট সংরক্ষিত থাকত। কিন্তু সূর্যের আলোর মত স্পষ্ট কথা এটাই যে, শুধু রাসূল কেন কোন ছাহাবীর নিকটেও কুরআনের পূর্ণাঙ্গ লিখিত রূপ ছিল না। এজন্যই ওমর (রাঃ) যখন আবু বকর (রাঃ)-কে কুরআন লিখিত আকারে একত্রিত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন,

كيفَ أفعلُ شيئًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

'আমি সে কাজ কেমনে করব, যা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) করেন নি![১৬]

এ আছারটি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, রাসূল (ছাঃ) কুরআন লিখিত আকারে একত্রিত করেন নি বা তার এমন ইচ্ছাও ছিল না। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে কেন তিনি কুরআন লিপিবদ্ধ করাতেন? উত্তর হচ্ছে, ছাহাবীগণের সংখ্যা অনেক ছিল। সেজন্য, সকলের নিকট নির্দিষ্ট সময়ে মসজিদে এসে কুরআন মুখস্থ করার সুযোগ ছিল না। তাই মুখস্থের জন্য বিভিন্ন ছাহাবী লিখিত আকারে কুরআন গ্রহণ করতেন। একজনের মুখস্থ হয়ে গেলে, সেটা আরেকজনকে দিয়ে দিতেন। এভাবে হিফযের মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ হত।

১৬. বুখারী হা/৪৬৭৯।

কুরআনের সংরক্ষণের ভিত্তি যে হিফয ছিল তার প্রমাণ এ ঘটনাতেই পাওয়া যায়। ওমর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন,

إِنَّ القَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ بِقُرَّاءِ القُرْآنِ يَوْمَ اليَمَامَةِ وَإِنِّي لَأَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ القَتْلُ بِالقُرَّاءِ فِي المَوَاطِنِ كُلِّهَا فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ القُرْآنِ.

‘ইয়ামামার দিন কুরআনের ক্বারীগণকে ব্যাপকহারে হত্যা করা হয়েছে। আর আমি আশংকা করছি, অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রেও কারীদের হত্যা বাড়তে পারে। তখন কুরআনের বিরাট অংশ হারিয়ে যেতে পারে। আমি মনে করি, আপনি কুরআন জমা করার নির্দেশ দেন’।[১৭]

ওমর (রাঃ)-এর এ মন্তব্য স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পবিত্র কুরআন এতদিন হাফেযগণের স্মৃতিশক্তির উপর ভিত্তি করে সংরক্ষিত ছিল। তাইতো তিনি হুফফাযে কুরআনের মৃত্যুতে কুরআন হারিয়ে যাওয়ার আশংকা করেছেন। শুধু তাই নয়, যখন তারা কুরআন জমা করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন জমাকৃত কুরআনকে হাফেযে কুরআনের মুখস্থ কুরআনের সাথে মিলিয়ে পরীক্ষা করে নিলেন। শুধু তাই নয়, কুরআন লিখিত আকারে জমা করা হলেও তা কপি করে মানুষের মাঝে বিলি করা হয়নি, বরং লিখিত সংরক্ষিত কপিটি আবু বকর (রাঃ)-এর নিকটে ছিল। অতঃপর ওমর (রাঃ)-এর নিকটে এবং তার মৃত্যুর পর উম্মুল মুমিনীন হাফছা (রাঃ)-এর কাছে ছিল। কুরআন জমা করার প্রায় এক যুগ পর উছমান (রাঃ) হাফছা (রাঃ)-এর নিকট থেকে তা নিয়ে কপি করে ইসলামী সাম্রাজ্যে বিলি করেন।

এ ঘটনা প্রমাণ করে, উছমান (রাঃ)-এর খিলাফাত পর্যন্ত লিখিত কপির কোন প্রয়োজন ছিল না। ছাহাবীগণের মুখস্থ শক্তিই যথেষ্ট ছিল। কুরআনের মত হাদীছ সংরক্ষণের ভিত্তিও যে ছিল ছাহাবীগণের মুখস্থ শক্তি, এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) থেকে স্পষ্ট ঘোষণা এবং ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়। তিনি বলেন, تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ ‘তোমরা শুনছ এবং তোমাদের নিকট থেকেও শুনা হবে। যারা তোমাদের নিকট থেকে শুনবে, তাদের নিকট থেকেও শুনা হবে’।[১৮]

তাহক্বীক্ব : আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ আবু জা‘ফর আর-রাযী ব্যতীত সনদের সকল রাবী বুখারী-মুসলিমের রাবী। তবে তিনিও মযবূত রাবী।

এ হাদীছে রাসূল (ছাঃ) স্পষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, ছাহাবীগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করছেন। ছাহাবীগণের কাছ থেকে তাবেঈগণ শ্রবণ করবেন এবং তাবেঈগণের কাছ থেকে আতবা‘এ তাবেঈগণ শ্রবণ করবেন। এ

১৭. প্রাগুক্ত।
১৮. আবু দাঊদ হা/৩৬৫৯।

হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর একটি মু'জিযাও প্রকাশ পায়। তাঁর করা ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আতবা'এ তাবেঈগণের যুগে হাদীছ লিপিবদ্ধ করার স্বর্ণযুগ শুরু হয়। তার পূর্ব পর্যন্ত হাদীছ সংরক্ষণের মূল ভিত্তি ছিল শ্রবণ ও স্মৃতিশক্তি। আর সত্যি বলতে কি মুখস্থ শক্তির মাধ্যমে কুরআন ও হাদীছ হিফাযত করা অসম্ভব কিছু ছিলনা। কেননা আরবগণের স্মৃতি শক্তির তুলনায় কুরআন ও হাদীছের ভাণ্ডার কিছুই নয়। তাদের স্মৃতিশক্তির বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

হাদীছ কেন লিখতে নিষেধ করা হয়েছিল?

যারা হাদীছ অস্বীকার করে, তাদের অন্যতম একটি দলীল হচ্ছে নীচের হাদীছটি। রাসূল (ছাঃ) বলেন,
عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَكْتُبُوا عَنِّى شَيْئاً إِلاَّ الْقُرْآنَ فَمَنْ كَتَبَ عَنِّى شَيْئاً غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 'তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমার নিকট থেকে কুরআন ব্যতীত কিছুই লিপিবদ্ধ করো না। যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখেছে, সে যেন তা মিটিয়ে দেয়'।[১৯] আসুন! আমরা উক্ত দলীলটি বিশ্লেষণ করি-

প্রথমত : হাদীছ লিখতে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে নিশ্চিতভাবে একটি হাদীছও প্রমাণিত নয়। এই একটি হাদীছই প্রাচ্যবিদদের অন্ধের যষ্ঠি। তারপরেও ইমাম বুখারীসহ অনেক মুহাদ্দিছ এই হাদীছটিকে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর নিজস্ব কথা বলে মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া এই হাদীছের বিপরীতে রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে হাদীছ লিপিবদ্ধ করার অগণিত দলীল আছে।

দ্বিতীয়ত : কোন হাদীছের সঠিক বুঝ ততক্ষণ পর্যন্ত আসে না, যতক্ষণ না তার সকল সনদ থেকে বর্ণিত টেক্সটগুলো জমা করা হয়। হাদীছ অস্বীকারকারীরা এ হাদীছটির পূর্ণরূপ কখনোই পেশ করে না। অথচ স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) এ হাদীছটির পূর্ণরূপে হাদীছ অস্বীকারকারীদের নিকৃষ্ট ইস্তিদলাল বা দলীল উপস্থাপনের রাস্তা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছেন। হাদীছটির পূর্ণরূপ নিম্নে পেশ করা হল,
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

১৯. মুসলিম হা/৩০০।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা আমার নিকট থেকে কুরআন ব্যতীত কিছুই লিপিবদ্ধ করো না। যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখেছে, সে যেন তা মিটিয়ে দেয়। আর তোমরা আমার নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা কর। কোন সমস্যা নেই। তবে যে আমার নামে মিথ্যারোপ করবে, তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম’।[২০]

হাদীছটি ঠিক এভাবে পূর্ণরূপে ছহীহ মুসলিমে এসেছে এবং আবু ওবায়দা, আফফান, হাদ্দাব খালিদসহ হাম্মামের অনেক ছাত্র এভাবেই বর্ণনা করেছেন। হাদীছটির পূর্ণরূপে রাসূল (ছাঃ)-এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট। তিনি বিশেষ কোন কারণে হাদীছ লিখতে নিষেধ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু এর পাশাপাশি হাদীছ বর্ণনা করার নির্দেশও দিয়েছিলেন। হাদীছ অস্বীকারকারীদেরকে বলছি, কোন্ স্বার্থ তোমাদেরকে একচোখা বানালো? কেন কোনদিন হাদীছটি পূর্ণরূপে বর্ণনার সৎসাহস হলো না?

তৃতীয়ত : রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীগণকে হাদীছ লিখতে নিষেধ করেছিলেন মূলতঃ দু’টি কারণে: (১) হাদীছ মুখস্থের প্রতি তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। কেননা লেখার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে গেলে মুখস্থ করা হয় না। আর এটি অতি পরিক্ষিত বাস্তবতা। (২) কুরআন এবং হাদীছ মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার আশংকা, যা অতীত উম্মতের ক্ষেত্রে ঘটেছিল।[২১] কারণটি বাস্তব সম্মতও বটে। কেননা সে সময় অল্প সংখ্যক মানুষ লিখতে জানতেন। লেখার জন্য বর্তমান যুগের মত কাগজ-কালিও ছিল না। গাছের পাতায়, পাথরে, কাঠে ইত্যাদিতে লেখা লিখতে হত। লেখার জায়গার সংকীর্ণতা ও লেখকের অপ্রতুলতার কারণে হাদীছ লিখতে চাইলে কুরআনের সাথেই লিখতে হত। আর তা পার্থক্য করতে চাইলে ছাহাবীগণের জন্য খুবই মুশকিল হয়ে যেত। সুতরাং হাদীছ লিখতে নিষেধ করার কারণ না জানার ভান করে এবং আধুনিক যুগের উপর সেই সময়কে কিয়াস করে এই অভিযোগ উত্থাপন করা একচোখা এবং ইতিহাস অজ্ঞ মানুষ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না ।

চতুর্থত : যেহেতু হাদীছ অস্বীকারকারীগণের নিকটে হাদীছের ভাণ্ডার অবিশ্বাসযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য, সেহেতু রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত এই নির্দেশও তাদের নিকটে অবিশ্বাসযোগ্য হওয়া উচিৎ। কেননা এটাও তো হাদীছের ভাণ্ডার থেকে নেওয়া। নাকি নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থের সময়ই কেবল হাদীছকে দলীল হিসাবে পেশ করা যাবে! ধিক তোমাদের, শত ধিক!

২০. মুসলিম হা/৩০০৪।
২১. বুহূছ ফী তারীখিস-সুন্নাহ ২২৫ পৃঃ।

হাদীছ অস্বীকারকারীদের জন্য বাধ্যতামূলক হচ্ছে, তারা হাদীছের ভাণ্ডার ব্যতীত অন্য কোথাও থেকে শক্তিশালী দলীল পেশ করুক, যেখানে হাদীছ লিখতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, ক্বিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করলেও তাদের জন্য তা সম্ভব নয়।

পঞ্চমত : এ হাদীছটিই জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে যে, মুহাদ্দিছগণ হাদীছ কতটা আমানতের সাথে সংরক্ষণ করেছেন। কেননা তারা জানতেন এই হাদীছ দিয়ে হাদীছের ভাণ্ডারে অভিযোগ উত্থাপন করা হতে পারে। তারা চাইলে এই হাদীছ বর্ণনা ও লেখা বন্ধ করে দিতে পারতেন। কিন্তু হাদীছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তারা এতটাই আমানাতদার ছিলেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর এই হাদীছকেও তারা নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করেছেন।

রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় হাদীছ লিপিবদ্ধ করার অকাট্য দলীল

দলীল-১

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ.

‘আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছ থেকে যা কিছু শুনতাম, লিখে রাখতাম। কিন্তু আমাকে কুরায়শরা লিখতে নিষেধ করল এবং বলল, তুমি কি রাসূল (ছাঃ)-কে যা বলতে শোন, তাই লিখে রাখ, অথচ তিনি একজন মানুষ?! তিনি কখনো রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন, আবার কখনো খুশী অবস্থায় কথা বলেন। তখন আমি হাদীছ লেখা বন্ধ করে দিলাম এবং রাসূল (ছাঃ)-কে বিষয়টি জানালাম। রাসূল (ছাঃ) জবাবে তাঁর নিজের মুখের দিকে ইশারা করে বললেন, লিখতে থাক! সেই সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! এই মুখ দিয়ে হক্ব ব্যতীত কিছুই বের হয় না’।[২২]

তাহক্বীক্ব: হাদীছটির সনদে সকল রাবী ‘মযবূত’।

দলীল-২

২২. আবু দাঊদ হা/৩৬৪৬।

ওহাব ইবনু মুনাব্বিহ বলেন,

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُول لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي مَا خَلَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْه فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ.

‘আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কোন ছাহাবী আমার চেয়ে বেশী হাদীছ জানতেন না, তবে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ব্যতীত। কেননা তিনি লিখতেন আর আমি লিখতাম না’।[২৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ)-এর লিখিত এ পান্ডুলিপিগুলো ‘ছহীফায়ে ছাদেক্বা’ নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

দলীল-৩

বিদায় হজ্জের দিন রাসূল (ছাঃ) যখন ভাষণ শেষ করলেন, তখন আবু শাহ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ.

‘হে আল্লাহর রাসূল! (খুত্বাটা) আমাকে লিখে দিন। রাসূল (ছাঃ) তখন ছাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও।[২৪]

দলীল-৪

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ.

‘নিশ্চয় রাসূল (ছাঃ) ইয়ামানবাসীর নিকট আমর ইবনে হাযমের হাতে একটি পুস্তিকা লিখে পাঠান, যাতে ফারায়েয, সুন্নাত এবং রক্তমূল্যের বিবরণ ছিল’।

তাহক্বীক্ব : এ পুস্তিকায় বর্ণিত হুকুম-আহকাম নিয়ে মতভেদ থাকলেও এ নিয়ে কোন মতভেদ নেই যে, আল্লাহর রাসূল আমর ইবনে হাযমকে এই পুস্তিকা দিয়ে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন।

দলীল-৫

বিভিন্ন বাদশাহর নিকটে রাসূল (ছাঃ) লিখিতভাবে ইসলামের দা‘ওয়াত পাঠিয়েছেন। রোম, পারস্য ও নাজ্জাশীর পরাক্রমশালী বাদশাহগণের নিকটে রাসূল (ছাঃ) যে চিঠিগুলো পাঠিয়েছিলেন, সেগুলো হাদীছ হিসেবে আজও

২৩. বুখারী হা/১১৩।
২৪. ছহীহ বুখারী হা/২৪৩৪।

হাদীছের কিতাবগুলিতে সংরক্ষিত আছে। উক্ত চিঠিগুলো থেকে যুগে যুগে ফুক্বাহায়ে ইযাম অনেক মাসআলা বের করেছেন।[২৫]

উপরোক্ত দলীলগুলো থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই হাদীছ লিপিবদ্ধ শুরু হয়।

রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হাদীছের গুরুত্ব

রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট তাঁর হাদীছের গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি তাঁর হাদীছের হেফাযতের জন্য যেমন সুসংবাদ দিয়েছেন, তেমনি তার নামে মিথ্যা হাদীছ তৈরির বিষয়ে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। যেমন, তিনি বলেন,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

‘তোমরা আমার নিকট থেকে একটি হাদীছ হলেও বর্ণনা কর! আর বনী ইসরাঈলের কাহিনীও বর্ণনা কর! কোন সমস্যা নেই। যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করল, তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম।[২৬]

মানুষ যে একদিন তার হাদীছ অমান্য করবে, তাও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

ألا يوشِكُ رَجُلٌ شَبعانُ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وَجَدتُم فيه من حلالِ فأَحِلُّوه وما وجدتُم فيه من حَرَامٍ فحَرِّمُوه.

‘সাবধান! অচিরেই কেউ পরিতৃপ্তিসহ তার আসনে ঠেস দিয়ে বলবে, তোমরা শুধু এই কুরআন মেনে চলবে। তোমরা কুরআনে যা হালাল পাও, তা হালাল মনে কর এবং কুরআনে যা হারাম পাও, তা হারাম মনে কর’রাসূল (ছাঃ) [২৭] ! তাঁর সুন্নাত অনুসরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার দলভুক্ত নয়’।[২৮] তিনি তাঁর হাদীছ মুখস্থকারীদের সুসংবাদ দিয়ে বলেন,

عن زيد بن ثابت قال سمعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلم يقول نَضَّرَ الله امرَأً سَمِعَ منَّا حديثاً فحفِظَه حتى يُبَلِّغَهُ.

২৫. বুখারী হা/ ৭।
২৬. ছহীহ বুখারী হা/৩৪৬১।
২৭. আবু দাঊদ হা/৪৬০।
২৮. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৯৭।

যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) -কে বলতে শুনেছি, 'মহান আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করুন! যে আমার কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করে, অতঃপর তা মুখস্থ করে অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়'।[২৯]

তাহক্বীক্বীক্ব : হাদীছের সনদের সকল রাবী 'মযবূত্ব' (ثقة)।

শুধু তাই নয়, হাদীছ মুখস্থ করার জন্য রাসূল (ছাঃ) সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন। যখন আব্দুল ক্বায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল তাঁর নিকটে আসেন, তখন তাদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল শিখিয়ে দেওয়ার পর বলেন, احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءكُمْ. 'তোমরা মুখস্থ করে নাও এবং তোমাদের পরে যারা আছে, তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও'।[৩০] বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ 'তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে যেন পৌঁছিয়ে দেয়'।

বিদায় হজ্জের এ ভাষণ কুরআনের সূরা কিংবা আয়াত নয়; বরং রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ। রাসূল তা সকলের নিকটে পৌঁছিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।[৩১]

এ আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হাদীছ সংরক্ষণ ও তার অনুসরণের গুরুত্ব কুরআনের অনুসরণের মতই।

খোলাফায়ে রাশেদীন কেন শুধু কুরআন সংকলন করলেন?

হাদীছ অস্বীকারকারীদের অন্যতম একটি অভিযোগ হচ্ছে, খোলাফায়ে রাশেদীন যেভাবে কুরআন সংকলন করেছেন, সেভাবে তাঁরা হাদীছ সংকলন করেননি কেন? যদি হাদীছ তাঁদের নিকটে কোন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় হত, তাহলে অবশ্যই তাঁরা তা সংকলন করতেন। এ অভিযোগের আমরা কয়েকভাবে জবাব দিব-

প্রথমত : কুরআন সংকলনের জন্য যেমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, হাদীছ সংকলনের জন্য তেমন পরিবেশ তখনো সৃষ্টি হয়নি। ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক কুরআনের হাফেয মারা যাওয়ায় ওমর (রাঃ) চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে হাদীছের হাফেযগণ জীবিত ছিলেন। যদি কোন যুদ্ধে আনাস (রাঃ), ইবনু ওমর (রাঃ), ইবনু আব্বাস (রাঃ), আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখের কেউ মারা যেতেন বা সবাই মারা যেতেন, তাহলে অবশ্যই তাঁরা

২৯. আবু দাঊদ হা/৩৬৬০।
৩০. আবু দাঊদ হা/৩৬৬০।
৩১. বুখারী হা/১৭৩৯।

হাদীছও জমা করতেন। হতে পারে, এটাও মহান আল্লাহর একটা পরিকল্পনার অংশ। তাইতো তিনি হাফেযে হাদীছগণকে জীবিত রেখেছিলেন।

দ্বিতীয়ত : কুরআনের অন্যতম মু'জিযা হচ্ছে তার শব্দ অলংকার, সাহিত্যিক মান। এজন্য কুরআন হুবহু সংরক্ষিত রাখার প্রয়োজন ছিল। হাদীছের বিষয়টি এমন ছিল না।

তৃতীয়ত : কুরআনে বিকৃতি ও মতভেদ দেখা দেওয়ায় উছমান (রাঃ) কুরআনের কপি সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তখনো রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা বলার প্রচলন শুরু হয়নি। হাদীছে কোন বিকৃতি বা মতভেদ শুরু হয়নি। তাই তারা এ বিষয়ে চিন্তা করেন নি। হাদীছে মতবিরোধ উছমান (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর শুরু হয়। এটাও মহান আল্লাহর পরিকল্পনার অংশ।

চতুর্থত : ছাহাবায়ে কেরাম সুন্নাতকে নিজেদের আমল ও পঠন-পাঠনের মাধ্যমে জীবিত রেখেছিলেন। এজন্য খোলাফায়ে রাশেদীন তা সংকলনের প্রয়োজন মনে করেন নি।

পঞ্চমত : খোলাফায়ে রাশেদীনের রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদীছ সংকলন না করাকে ছুতো বানিয়ে 'তারা হাদীছকে দলীলযোগ্য মনে করতেন না' মন্তব্য করা তাঁদের উপর ডাহা মিথ্যা অপবাদ বৈ কিছুই নয়। স্বয়ং তাঁরাই রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের কারণে নিজেদের বহু সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ঝুঁকি নিয়েছেন। হাদীছের অনুসরণে তাদের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত যথা স্থানে পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ওমর (রাঃ) হাদীছ লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে কেন তা পরিত্যাগ করলেন?

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ السُّنَنَ فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارُوا عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَهَا فَطَفِقَ عُمَرُ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ أَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ عَزَمَ اللَّهُ لَهُ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ السُّنَنَ وَإِنِّي ذَكَرْتُ قَوْمًا كَانُوا قَبْلَكُمْ كَتَبُوا كُتُبًا فَأَكَبُّوا عَلَيْهَا وَتَرَكُوا كِتَابَ اللَّهِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَلْبِسُ كِتَابَ اللَّهِ بِشَيْءٍ أَبَدًا.

উরওয়া বিন যুবায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নিশ্চয় ওমর (রাঃ) সুন্নাতসমূহ লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছাপোষণ করেন। এ বিষয়ে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেন। সকল ছাহাবী তাঁকে লেখার পরামর্শ দেন। অতঃপর তিনি এ বিষয়ে এক মাস যাবত ইস্তিখারা করেন। ইতিমধ্যেই একদিন মহান আল্লাহ তাঁকে পাকা-পোক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার তওফীক্ব দান করেন।

তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি সুন্নাতসমূহ লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম, কিন্তু আমার স্মরণ হল তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির কথা, যারা কিতাবসমূহ লিখেছিল, অতঃপর তারা সেটা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহর কিতাবকে পরিত্যাগ করেছিল। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর কিতাবের সাথে কিছুই কখনো মিশ্রিত করব না’।[৩২]

এ বর্ণনাটি প্রাচ্যবিদর ও হাদীছ অস্বীকারকারীরা খুব প্রচার করে থাকে। কিন্তু তারা নীচের বিষয়গুলি ভেবে দেখেছে কি কখনোও?

(ক) এই ঘটনার সব সূত্র বিচ্ছিন্ন। সনদের রাবী উরওয়া ওমর (রাঃ)-এর যুগ পাননি।

(খ) এ বর্ণনাটি তো প্রাচ্যবিদদের বিপক্ষের দলীল। কেননা এ ঘটনায় হাদীছ সংকলন করা ও লিপিবদ্ধ করার পক্ষে ছাহাবায়ে কেরামের ইজমা প্রমাণিত হয়।

(গ) যেহেতু হাদীছ অস্বীকারকারীদের নিকটে হাদীছের ভাণ্ডার অবিশ্বাসযোগ্য, সেহেতু ওমর (রাঃ)-এর এ ঘটনাকে তারা দলীল হিসাবে পেশ করে কি করে?!

(ঘ) হাদীছ সংকলনের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করা শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয়ভাবে সংকলন না করার সিদ্ধান্ত ছিল। ব্যক্তিগতভাবে ছাহাবায়ে কেরাম হাদীছ লিপিবদ্ধ করা ও প্রচার করা কোন সময়ই বন্ধ করেননি। যার বিস্তারিত দলীল যথা জায়গায় আসছে ইনশাআল্লাহ।

(ঙ) ওমর (রাঃ) হাদীছ লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত এ কারণে পরিত্যাগ করেন নি যে, হাদীছ দলীলযোগ্য নয় বা হাদীছ লেখা জায়েয নয়; বরং তিনি কুরআনের সাথে হাদীছ মিশ্রিত হওয়ার আশংকা করেছেন, বর্ণনায় যা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, আমরা পূর্বেও বলেছি, রাসূল (ছাঃ) এ আশঙ্কার কারণেই হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন। তাহলে পুনরায় সে আশঙ্কা কিভাবে তৈরি হল?

এই প্রশ্নের উত্তরের সাথে মানব সমাজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আপনি মনে করুন! আপনার পিতা নিজের গল্পও আপনাদেরকে শুনাতেন আবার তার কোন গুরু বা উস্তায বা শিক্ষকের কথাও আপনাদেরকে শুনাতেন। হঠাৎ একদিন আপনার বাবা মারা গেলেন। স্বভাবজাতভাবে আপনারা আপনাদের পিতার জীবনের বিভিন্ন দিক স্মৃতি চারণ করবেন। তিনি কি বলতেন, কি করতেন, কি তার ইতিহাস, কবে কোথায় তার সাথে কি হয়েছিল ইত্যাদি । অপর দিকে খুব কমই তার সেই উস্তাদ বা গুরুর

৩২. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২০৪৮৪।

স্মৃতি চারণ করবেন, যার কথা আপনার বাবা আপনাদেরকে শুনাতেন। কেননা আপনারা তাকে স্বচক্ষে দেখেননি, কিন্তু আপনার পিতাকে স্বচক্ষে দেখেছেন। এই পার্থক্যটা মানুষের স্বভাবজাত। এবার আসি আসল কথায়, ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে প্রচণ্ড ভালবাসতেন। হাদীছে এসেছে, উরওয়া তাঁর গোত্রের নিকট ফিরে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে বলেন,

وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مُحَمَّدًا وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِى كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ.

'আল্লাহর কসম! আমি অনেক রাজা-বাদশাহর দরবারে প্রতিনিধি হিসেবে গেছি। আমি কিসরা, কায়ছার ও নাজ্জাশীর দরবারেও গেছি। আল্লাহর কসম! আমি কোন বাদশাহ দেখিনি, যাকে তার সঙ্গী-সাথীরা এতটা সম্মান করেন, যতটা মুহাম্মাদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁকে সম্মান করেন। আল্লাহর কসম! যদি তিনি নাক থেকে কোন ময়লা বের করেন, তাহলে সেটা তাদেরই কারো হাতে পড়ে। (তারা মাটিতে পড়তে দেয় না, বরকত হিসেবে গ্রহণ করে) এটা তো গেল তাঁর চেহারা ও শরীর বিষয়ক। আর যখন তিনি তাঁদেরকে কোন নির্দেশ দেন, তখন তাঁরা দ্রুতগতিতে সেই কাজের দিকে ধাবিত হয়। যখন তারা কথা বলেন, তখন তাঁর সামনে তাদের কণ্ঠ নীচু করে কথা বলেন। তারা কেউ সম্মানের আধিক্যের কারণে তার দিকে চোখ তুলে তাকান না'।[৩৩]

এ হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-কে সীমাহীন ভালবাসতেন। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কা ছিল। তাঁরা কোনদিন এত কষ্ট পান নি, যত কষ্ট রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুতে পেয়েছিলেন। ঠিক এই মুহূর্তে যদি তাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর কথা ও কাজের সংকলন করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাহলে অবস্থা কি হবে তা কল্পনাতীত। তাঁরা সীমাহীন আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথেই এই কাজ করবেন। অবশেষে হাদীছ জমা করার কাজ শেষ হয়ে গেলে তারা সবাই পাগলের মত যার যে হাদীছ জানা থাকবে না, তা মুখস্থ করা ও জানার চেষ্টা করবেন। এভাবে তাদের অজান্তেই কুরআন অবহেলিত হয়ে যাবে। আর যদি খলিফাগণ চাপ দিয়ে এর সাথে সাথে কুরআন শিখারও ব্যবস্থা করতেন, তাহলে হাদীছ ও কুরআন মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ছাহাবায়ে কেরামের মানসিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়েই খোলাফায়ে রাশেদীন চাচ্ছিলেন আগে কুরআন মানুষের মগজে আলাদাভাবে বসে যাক, তারপর হাদীছ সংকলন

৩৩. ছহীহ বুখারী হা/২৭৩১।

করা হবে । তাদের এ সিদ্ধান্ত কতটা যৌক্তিক ছিল তা একজন বিবেকবান মাত্রই অনুধাবন করতে পারবেন।

লেখার চেয়ে মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ বেশী নির্ভরযোগ্য

কেউ যদি কোন উপন্যাস বা নাটক বইয়ের পাতায় পড়ে, তাহলে যতটা বুঝতে পারবে, তার চেয়ে বেশী বুঝতে পারবে, যদি সে সেই নাটক বা উপন্যাস ভিডিওতে অভিনীত অবস্থায় দেখে। তেমনি কোন বই যখন কেউ ঘরে বসে একাকী পড়বে, তখন যতটা বুঝতে পারবে, তার চেয়ে বেশী বুঝতে পারবে, যদি সে কোন শিক্ষক বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে তা পড়ে । এজন্য হাদীছ লিখা শুরু হওয়ার পরেও মুহাদ্দিছগণ লেখার চেয়ে শ্রবণ ও স্মৃতি শক্তিকে বেশী গুরুত্ব দিতেন। মুহাদ্দিছগণের মূলনীতি অনুযায়ী কোন রাবী যদি শায়খের কাছ থেকে 'শুনেছি' বলে স্মৃতি শক্তি থেকে হাদীছ বর্ণনা করে, তাহলে তার হাদীছ ঐ রাবীর উপর প্রাধান্য পাবে, যে কোন শায়খের লিখিত বই থেকে হাদীছ বর্ণনা করে। কেননা বই থেকে হাদীছ শুনালে ইবারত পড়তে ভুল হতে পারে; যের, যবর ও পেশে ভুল হতে পারে। তখন হাদীছের অর্থ উল্টা হয়ে যাবে। কিন্তু যে রাবী শায়খের নিকট থেকে শ্রবণ করে হাদীছ মুখস্থ করেছেন, তাঁর ইবারতে কোন ভুল হবে না। কেননা তিনি হুবহু শায়খের মুখ থেকে শুনেছেন, ঠিক যেভাবে তাঁর শায়খ ছাহাবীর মুখ থেকে শুনেছিলেন এবং ছাহাবী যেভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখ থেকে শুনেছিলেন। এছাড়া অনেক সময় রাবী তাঁর শায়খের হাদীছ বর্ণনার বাচনভঙ্গি অভিনয় করে দেখান, ঠিক যেমনটা রাসূল করেছিলেন। এসব বিভিন্ন কারণে লিখিত আকারে হাদীছ সংরক্ষণের চেয়ে মুখস্থ আকারে হাদীছ সংরক্ষণ ছিল বেশী মযবূত ও কল্যাণকর।

হাদীছ সংরক্ষণের উপাখ্যান

উম্মতে মুসলিমা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সংরক্ষণে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। দুনিয়ার এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার পুরো জীবনী এভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে, যেভাবে মুহাদ্দিছগণ রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী সংরক্ষণ করেছেন। প্রাকৃতিক প্রয়োজন সংক্রান্ত রাসূল (ছাঃ)-এর কথা ও কাজ থেকে শুরু করে একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন পর্যন্ত তাঁর সকল কাজ ও আমল সবই সংরক্ষিত। শুধু সংরক্ষিত নয়; সনদসহ সংরক্ষিত, বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষিত। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনকে পুংখানুপুংখরূপে সংরক্ষণ করতে গিয়ে এমন কিছু নযীরবিহীন শাস্ত্রের আর্বিভাব দুনিয়াতে হয়, যা একমাত্র মুসলিমদের নিকটে আছে এবং মুসলিমদেরই উদ্ভাবিত: রিজাল শাস্ত্র, জার্হ ওয়াত-তা'দীল শাস্ত্র, উলূমুল হাদীছ শাস্ত্র। তারা শুধু রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনীই সংরক্ষণ

করেননি; বরং রাসূল (ছাঃ)-এর সার্বিক জীবনীর সংবাদ বাহক লক্ষ লক্ষ রাবীর জীবনীও সংরক্ষণ ও সংকলন করেছেন। শুধু সংকলন নয়, তাদের জীবনী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণও করেছেন। তাদের জন্ম-মৃত্যু থেকে শুরু করে, স্মৃতিশক্তি ও ন্যায়পরায়ণতার অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরেছেন। লক্ষ লক্ষ রাবীর অবস্থা যাচাই-বাছাই করতঃ লক্ষ লক্ষ যঈফ ও জাল হাদীছের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছগুলো বাছাই করার মাধ্যমে তারা পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। আজ অবধি তা সংরক্ষিত আছে। ফালিল্লাহিল হামদ। নীচে হাদীছ সংরক্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পেশ করা হল :

খোলাফায়ে রাশেদীনের হাদীছ লেখার অকাট্য দলীল

খোলাফায়ে রাশেদীন লিখে রাখার মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সংরক্ষণ করতেন। নীচে তার কিছু দলীল পেশ করা হল :

দলীল-১

أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ.

আনাস (রাঃ) বলেন, ‘আবু বকর (রাঃ) যখন তাকে বাহরাইনে পাঠান, তখন তাঁকে এই পুস্তিকাটি লিখে দেন। পুস্তিকাটিতে ছিল-‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। ইহা যাকাতের হিসাব, যা রাসূল (ছাঃ) ফরয করেছেন এবং সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন’।[৩৪] এই চিঠি বা পুস্তিকাতে আবু বকর (রাঃ) পশু-প্রাণী ও অর্থ সম্পদ থেকে শুরু করে যাকাতের সকল হিসাব লিপিবদ্ধ করে আনাস (রাঃ)-কে প্রদান করেন। তথা ইসলামের ৩য় স্তম্ভকে প্রথম খলীফা আবু বকর (রাঃ) লেখনীর মাধ্যমে হেফাযত করেন।

উল্লেখ্য যে, আবু বকর (রাঃ)-এর নামে প্রাচ্যবিদরা প্রচার করে, ‘তিনি ৫০০ হাদীছ লেখার পর জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন’। এই ঘটনার কোন বিশুদ্ধ সনদ নেই। বরং ঘটনার প্রকৃতি প্রমাণ করে, ঘটনাটি মিথ্যা।

দলীল-২

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا أُصْبُعَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً.

৩৪. বুখারী হা/১৪৫৪।

আবু উছমান আন-নাহদী হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘ওমর (রাঃ) উতবা ইবনে ফারক্বাদের নিকটে লিখে পাঠান, ‘নিশ্চয় রাসূল (ছাঃ) রেশমের পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, তবে এক-দুই আঙ্গুল, তিন-চার আঙ্গুল সমপরিমাণ হলে কোন সমস্যা নেই’।[৩৫]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটির সকল রাবী ‘মযবূত’।

দলীল-৩

فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

ওমর (রাঃ) আবু উবায়দা ইবনুল-জাররাহ (রাঃ)-কে লিখে পাঠান, ‘নিশ্চয় রাসূল (ছাঃ) বলতেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ঐ ব্যক্তির মাওলা, যার কোন মাওলা নেই। আর যার কোন ওয়ারিছ নেই, মামা তার ওয়ারিছ’।[৩৬]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটির সকল রাবী ‘মযবূত’। দুই জন ব্যতীত। আব্দুর রহমান ইবনে হারিছ ইবনে আব্দুল্লাহ এবং হাকীম ইবনে হাকীম ইবনে আব্বাদ। তবে, উভয়েই ‘ছদূক্ব’ রাবী।[৩৭]

দলীল-৪

আবু জুহায়ফা থেকে বর্ণিত, তিনি আলী ইবনে আবু ত্বালেব (রাঃ)-কে তাঁর নিকট কোন কিতাব আছে কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বলেন, তাঁর নিকট কুরআন ছাড়া একটি ছহীফা আছে।

قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ العَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

আবু জুহায়ফা বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সেই ছহীফাতে কি আছে? তিনি বললেন, তাতে রক্তমূল্য, বন্দিমুক্তি (বিষয়ক হুকুম-আহকাম) আছে এবং আরো আছে, কোন মুসলিমকে কাফেরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না’।[৩৮]

উপরের আলোচনা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হল যে, খোলাফায়ে রাশেদীন হাদীছ লিখতেন।

৩৫. আবু দাঊদ, হা/৪০৪২।
৩৬. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৯।
৩৭. আল কাশিফ, রাবী নং ১২০০; তাহযীবুল কামাল, রাবী নং ৩৭৮৭।
৩৮. বুখারী হা/১১১।

হাদীছ সংরক্ষণে ছাহাবীগণের অবদান

(১) ছাহাবায়ে কেরাম হাদীছ মুখস্থ করতেন :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

‘আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘নিশ্চয় আমরা হাদীছ মুখস্থ করতাম। আর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে হাদীছ মুখস্থ করা হত’।[৩৯]

قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ.

সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) বলেন, ‘আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সময় ছোট ছিলাম। আমি তাঁর কাছ থেকে হাদীছ মুখস্থ করতাম’।[৪০]

(২) হাদীছ সংরক্ষণের জন্য দরজায় সামনে বসে থাকা :

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনছারের একজন ব্যক্তিকে বললাম, চলো! আমরা ছাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা আজ সংখ্যায় অনেক। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আব্বাস! তুমি কি মনে কর যে, একদিন মানুষ তোমার মুখাপেক্ষী হবে? এই বলে তিনি আমার সাথে গেলেন না। আর আমি ছাহাবীগণের নিকট থেকে ইলম সংগ্রহের প্রতি মনোযোগ দিলাম। একদা আমার নিকট একটা হাদীছের বিষয়ে সংবাদ পৌঁছল। আমি সেই ছাহাবীর বাড়ীতে আসলাম। তিনি তখন ঘুমাচ্ছিলেন, আমি আমার চাদরকে তার দরজার উপর রেখে বালিশ বানালাম। ইতিমধ্যে বাতাস প্রবাহিত হওয়ায় আমার মুখমণ্ডল ধূলায় মলিন হয়ে গেল। অতঃপর তিনি দরজা খুলে বের হয়ে আমাকে দেখে বললেন, হে রাসূল (ছাঃ)-এর চাচার ছেলে! তুমি এখানে কেন? আমাকে ডাকতে, আমি চলে আসতাম। তখন আমি বললাম, না, আমারই আপনার নিকট আসা বেশী যুক্তিযুক্ত। অতঃপর আমি তাঁকে সেই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। এইভাবে ইলম হাছিল করতে করতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) একদিন মুসলমিদের বড় আলেমে পরিণত হলেন। একদিন আনছারের সেই ব্যক্তিটি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে দারস দিতে দেখলেন। দেশ-বিদেশের ত্বালেবে ইলম বা শিক্ষার্থীগণ তাঁর চারপাশে দারস নিচ্ছেন। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় ইবনু আব্বাস আমার চেয়ে বুদ্ধিমান।[৪১]

৩৯. মুক্বাদ্দিমা মুসলিম ১/১৩।
৪০. মুসলিম, হা/৯৬৪।
৪১. ফাযায়েলে ছাহাবা হা/১৯২৫; দারেমী হা/৫৯০।

তাহক্বীক্ব : হাদীছের সনদ ছহীহ। ইমাম হায়ছামী ও বূছীরী এ হাদীছের সকল রাবীকে 'মযবূত' বলেছেন। হাফেয ইবনু হাযার আসক্বালানী ছহীহ বলেছেন।[৪২]

(৩) হাদীছ সংরক্ষণের জন্য দীর্ঘ সফর :

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট একটি হাদীছের সংবাদ পৌঁছে। হাদীছটি যার নিকটে আছে, তিনি সিরিয়াতে থাকেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের (রাঃ) বলেন, আমি একটা উট ক্রয় করলাম অতঃপর সফরের প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে সফর করলাম। এক মাস সফর শেষে আমি সিরিয়াতে আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস আনছারী (রাঃ)-এর বাড়ীতে পৌঁছলাম। বাড়ীর দারোয়ানকে বললাম, তাঁকে বল, জাবের আপনার বাড়ীর দরজায়। ভিতরে খবর পৌঁছতেই আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ) তড়িঘড়ি করে দরজায় পৌঁছলেন। ছাহাবী জাবের বলেন, তাড়াহুড়ার কারণে তার কাপড় মাটিতে ছেঁচড়াচ্ছিল। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আমিও তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। অতঃপর আমি তাকে বললাম, ক্বিছাছ বিষয়ে একটি হাদীছ তোমার নিকটে আছে বলে আমি সংবাদ পেয়েছি। আমি এই ভয়ে চলে আসলাম, যদি এ হাদীছ শ্রবণের পূর্বে তুমি মারা যাও বা আমি মারা যাই। আমাকে হাদীছটি শুনাও! তখন তিনি হাদীছ শুনালেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে উলঙ্গ অবস্থায় একত্রিত করা হবে...কোন জান্নাতী জান্নাতে ও জাহান্নামী জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তার নিকটে কারো কোন হক্ব থাকলে তার ক্বিছাছ আদায় করা হবে তথা পরিশোধ করা হবে- যদিও তা একটা চড় হয়..। হাদীছ শ্রবণ শেষ হতেই জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) মদীনার রাস্তা ধরলেন।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটির সনদ হাসান। ইবনু হাযার, আলবানী ও আরনাউত্ব প্রমুখ (রহঃ) 'হাসান' বলেছেন।[৪৩]

ছাহাবায়ে কেরাম এভাবে শুধু একটি হাদীছের জন্য দরজার সামনে বসে থাকতেন, এক মাসের রাস্তা সফর করতেন শুধুমাত্র একটি হাদীছ শ্রবণ করার জন্য। আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) থেকেও অনুরূপ ঘটনা বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।[৪৪]

(৪) ছাহাবীগণের যুগে লিপিবদ্ধ কিছু ছহীফা :

ছাহাবীগণের নিকট থেকে তাবেঈগণ যে কিতাবগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন, তার একটা তালিকা নীচে পেশ করা হল:

৪২. আল-মাতালিবুল আলিয়া হা/৪৬০৯।
৪৩. ফাতহুল বারী ১/১৭৪।
৪৪. রিহলা, খত্বীব বাগদাদী ১২০-১২৪ পৃঃ ।

- ছহীফা আবু মূসা আল-আশ‘আরী। তুরস্কের শহীদ আলী লাইব্রেরীতে এ ছহীফাটি এখনো পাণ্ডুলিপি আকারে আছে।
- ছহীফা জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ। এই ছহীফাটিও তুরস্কের শহীদ আলী লাইব্রেরীতে এখনো পাণ্ডুলিপি আকারে আছে।
- নুসখা সামুরা ইবনে জুনদুব। হাফেয হাযার তাঁর তাহযীবুত তাহযীবে (৪/২৩৬) এ নুসখার বিষয়ে আলোচনা করেছেন।
- ছহীফা হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ। এই ছহীফা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।
- কিতাব সা‘দ ইবনে উবাদা। ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের কিতাবুল আহকামে এ কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন।
- ছহীফা আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা। ইমাম বুখারী কিতাবুল জিহাদে এ ছহীফার কথা উল্লেখ করেছেন।
- ছহীফা আবু সালামা আল-আশজাঈ। এ ছহীফাটি সিরিয়ার দামেশকের মাকতাবা যাহিরিয়্যাতে এখনো পাণ্ডুলিপি আকারে আছে।

(৫) ছাহাবীগণের হাতে গড়ে উঠা সেই প্রজন্ম :

ছাহাবীগণ শুধু হাদীছ লেখা, হাদীছের জন্য সফর করা ও হাদীছের সত্যতা যাচাই করার মধ্যেই নিজেদের খিদমতকে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং তাঁরা এমন একটা প্রজন্ম তৈরি করেন, যারা পরবর্তী প্রজন্মের নিকট নির্ভুলভাবে হাদীছ পৌঁছানোর পূর্ণ যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন । তাবেঈগণের এই প্রজন্ম ছাহাবীগণের সংস্পর্শে হাদীছ শ্রবণ ও লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে বেড়ে উঠেন। যেমন-

يَا أَبَا حَمْزَةَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع يَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ وَمِنَ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا الْعَلَاءُ فَقَالَ احْفَظُوا.

(‘একদা আনাস (রাঃ) জানাযার ছালাতে মেয়ে মুর্দার মাঝামাঝি এবং পুরুষ মুর্দার মাথা বরাবর দাঁড়ালেন। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল), হে আবু হামযা! রাসূল (ছাঃ) কি অনুরূপ করতেন? মেয়েদের জন্য আপনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে দাঁড়াতেন এবং পুরুষদের জন্য আপনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে দাঁড়াতেন? তখন আনাস (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, আলা (রহঃ) তখন অমাদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, তোমরা এটা মুখস্থ করে নাও![৪৫]

৪৫. মুসনাদে আহমাদ হা/ ১৩১১৪।

Contents

তাঁরা হাদীছ মুখস্থ করার ব্যাপারে এতটাই সজাগ ছিলেন যে, তাদের বিষয়ে বহু বর্ণনা এসেছে, তারা কুরআনের মত হাদীছ মুখস্থ করতেন।[৪৬]

তাঁরা শুধু মুখস্থ করাই নয় ছাহাবীগণের নিকট থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধও করতেন। মূসা ইবনে উকবা বলেন,وضع عندنا كريب حمل بعير من كتب ابن عباس 'আমাদের নিকট কুরাইব উট বোঝাই কিতাব রাখলেন, যা তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীছ থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন'।[৪৭]

তাবেঈ এবং তাবে' তাবেঈনগণের যুগে হাদীছ সংরক্ষণ

(১) তাবেঈগণের যুগে লিখিত হাদীছ গ্রন্থসমূহ :

- ছহীফা হাম্মাম মুনাব্বিহ।
- 'আবুয যুবায়ের মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম' মাকতাবা যাহিরিয়্যাতে পাণ্ডুলিপি আকারে আছে।
- 'ছহীফা আবু হুমায়দ আত-ত্বীল' তুরস্কের শহীদ আলী লাইব্রেরীতে পাণ্ডুলিপি আকারে আছে।
- 'আবু বুরদা' তুরস্কের শহীদ আলী লাইব্রেরীতে পাণ্ডুলিপি আকারে আছে।
- 'আইয়ূব আস সাখতিয়ানী' মাকতাবা যাহিরিয়্যাতে পাণ্ডুলিপি আকারে আছে।
- ছহীফা হিশাম ইবনে উরওয়া। এ ছহীফাটি সিরিয়ার দামেশকের মাকতাবা যাহিরিয়্যাতে পাণ্ডুলিপি আকারে আছে।

ছাহাবী ও তাবেঈগণের হাতে সংকলিত এই শতাব্দীর গ্রন্থগুলোকে মুহাদ্দিছীন 'ছহীফা' নামে নামকরণ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-এর ছহীফাকে 'ছহীফা সাদেক্বা' বলা হয়। এ ছহীফাগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট তিনটি:

(ক) বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় আকারে হাদীছ সাজানো নেই।

(খ) শুধু রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ জমা করা হয়েছে। ছাহাবী বা তাবেঈগণের ফৎওয়া নয়।

(গ) যুগ নিকটবর্তী ও কল্যাণের যুগ হওয়ায় সনদের যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন হয়নি।

(২) হাদীছ সংরক্ষণের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত :

৪৬. হাদীছ সংকলনের ইতিহাস ২২৮ পৃঃ।
৪৭. তাকয়ীদুল ইলম, খত্বীব বাগদাদী ১/১৩৬।

হাদীছ সংরক্ষণ ও সংকলনের জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে ছহীফায়ে হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ। যারা হাদীছ লিপিবদ্ধ করা হত না বলে হাদীছের ভাণ্ডারে সন্দেহের ধূম্রজাল তৈরি করতে চায়, এ ছহীফা তাদের মুখে কালিমা লেপন করার জন্য যথেষ্ট। আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বিখ্যাত ছাত্র হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ তাঁর উস্তাদ আবু হুরায়রা (রাঃ)-থেকে শ্রবণ করা হাদীছগুলি একটি পুস্তিকা আকারে লিপিবদ্ধ করেন। হাম্মাম (রহঃ) তাঁর ছাত্রদের মাঝে এই পুস্তিকার দারস দিতেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, মা'মার ইবনে রাশেদ। মা'মার ইবনে রাশেদ তাঁর উস্তাদের লেখা উক্ত ছহীফা তাঁর ছাত্রদের মাঝে দারস দিতেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, 'মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাকে'র লেখক ইমাম আব্দুর রাযযাক। আব্দুর রাযযাক তাঁর মুছান্নাফে এ ছহীফা থেকেও কিছু হাদীছ নিয়ে আসেন। এভাবে এই ছহীফার আলাদা দারস ছাত্র-শিক্ষক পরম্পরায় চলতে থাকে এবং বিভিন্ন সময় ইমামগণ তাঁদের বইয়ে এ ছহীফা থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে এ ছহীফার সকল হাদীছ নিয়ে আসেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমও তাঁদের বইয়ে এ ছহীফা থেকে অনেক হাদীছ পেশ করেছেন। যুগের পরিক্রমায় এ ছহীফার আলাদা দারস বন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহর কি অশেষ মেহেরবানী! এই যুগে এসে বার্লিনের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে এ ছহীফার একটি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন ড. হামীদুল্লাহ। সবচেয়ে আর্শ্চযের বিষয় হচ্ছে, এ পাণ্ডুলিপি তাহক্বীক্ব করার পর দেখা যায়, ইমাম আহমাদের মুসনাদে বর্ণিত এ ছহীফার হাদীছগুলোর সাথে এ পাণ্ডুলিপির একটা অক্ষরেরও কম-বেশী নেই। আল্লাহু আকবার! এ ছহীফা অকাট্যভাবে দু'টি বিষয় প্রমাণ করে : (১) ছাহাবীগণের যুগেই হাদীছ লেখা হত। (২) মুহাদ্দিছগণ হাদীছের আমানত রক্ষায় শতভাগ পাশ। সুতরাং এরপরেও যাদের চক্ষু খুলবে না, তাঁদের ধ্বংস সুনিশ্চিত। উল্লেখ্য যে বর্তমানে এই পান্ডুলিপি প্রকাশিত।

(৩) হাদীছ সংকলনের সরকারী নির্দেশ :

১ম শতাব্দী হিজরীর শেষ প্রান্তে ৫ম খলীফায়ে রাশেদা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) হাদীছ সংকলন ও সংরক্ষণের রাষ্ট্রীয় ফরমান জারী করেন।

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبْهُ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ.

ওমর ইবনে আব্দুল আযীয আবু বকর ইবনে হাযমের নিকট চিঠি লিখেন এ মর্মে, 'রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ অনুসন্ধান কর এবং তা লিপিবদ্ধ কর। কেননা আমি ইলম ও আলেমের হারিয়ে যাওয়ার আশংকা করছি'।[৪৮]

৪৮. ছহীহ বুখারী 'কিভাবে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে' অধ্যায় ১/৩১ পৃঃ ।

ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) তার এ ফরমান সব শহরের বড় বড় আলেমগণের নিকট প্রেরণ করেন। আলেমগণ তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী হাদীছ লিপিবদ্ধ করার কাজে পুরোদমে ঝাপিয়ে পড়েন। আগে থেকেই তারা ব্যক্তিগতভাবে হাদীছ লিপিবদ্ধ করে আসছিলেন, কিন্তু সরকারী ফরমান জারী হওয়ায় সেই কাজে সীমাহীন গতি সৃষ্টি হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রত্যেক শহরের বড় বড় আলেম তাদের শহরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রায় সকল হাদীছ লিপিবদ্ধ করে ফেলেছিলেন। এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন ইমাম যুহরী (রহঃ)। তিনি তাঁর লিখিত গ্রন্থ্গুলোর পাণ্ডুলিপি খলীফার দরবারে পাঠিয়েছিলেন বলেও জানা যায়।[৪৯]

(৪) হিজরী ২য় শতাব্দীতে সংকলিত গ্রন্থসমূহ (১০০-২০০ হিঃ) :

খলীফা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর ফরমান জারী হওয়ার পর ২য় শতাব্দী হিজরীতে উম্মতে মুসলিমার আলেমগণ অনেক হাদীছের বই লিপিবদ্ধ করেন। তন্মধ্যে প্রকাশিত আকারে আমাদের নিকট নিম্নোক্ত গ্রন্থ্গুলি এসে পৌঁছেছে-

- ‘মুআত্ত্বা মালেক’। প্রকাশিত ও প্রসিদ্ধ।
- ‘মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক’। প্রকাশিত।
- ‘কিতাবুয যুহদ’, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক। প্রকাশিত।
- ‘কিতাবুল জিহাদ’, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক। প্রকাশিত।
- ‘জামে‘ মা‘মার ইবনে রাশেদ’। হাবীবুর রহমান আ‘যমীর তাহক্বীক্বে মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাকের শেষে এ জামে‘র কিছু অংশ সংযুক্ত আকারে প্রকাশিত। এ জামে‘ প্রায় দশ খণ্ডে, তন্মধ্যে ৫ খণ্ড তুরস্কের শহীদ আলী লাইব্রেরীতে পাণ্ডুলিপি আকারে আছে।
- ‘মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক’। এই মুসনাদের কিছু অংশ প্রকাশিত। মূল পাণ্ডুলিপি আছে আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডুবলিনের লাইব্রেরীতে।
- ‘জুয সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা’। মিসর থেকে প্রকাশিত। এ জুযের কিছু অংশ পাণ্ডুলিপি আকারে উনেইযার শায়খ সুলায়মান ইবনে ছালেহ-এর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে আছে।
- ‘কিতাবুয-যুহদ’, ওয়াকী‘ ইবনে জাররাহ। তিন খণ্ডে আব্দুর রহমান আব্দুল জাব্বারের তাহক্বীক্বে প্রকাশিত।
- জামে‘ আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব। মুছত্বফা আবুল খায়েরের তাহক্বীক্বে দার ইবনিল জাওযী থেকে প্রকাশিত। প্রায় ৭০০ হাদীছ আছে এ জামে‘তে।

৪৯. বুহূছ ফী তারীখিস-সুন্নাহ ২৩২পৃঃ ।

- ‘কিতাবুল ক্বাদার’, অব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব। দারুস-সুলতান, মক্কা থেকে প্রকাশিত।
- ‘আছার আবি ইউসুফ’। প্রকাশিত।
- ‘আছার মুহাম্মাদ ইবনে হাসান’। প্রকাশিত।
- ‘মুসনাদ আবু দাঊদ আত-ত্বয়ালিসী’। প্রায় তিন হাযার হাদীছের সমাহার। প্রথম প্রকাশ ভারতের হায়দারাবাদে। বর্তমানে মিসরের দার ইবনে হাযার থেকে প্রকাশিত।
- ‘মুসনাদ শাফেঈ’। প্রকাশিত।

(৫) হিজরী ২য় শতাব্দীতে সংকলিত গ্রন্থগুলোর বৈশিষ্ট্য :

এই শতাব্দীতে সংকলিত অধিকাংশ গ্রন্থকে জামে‘, মুসনাদ, মুআত্ত্বা ও মুছান্নাফ নামে নামকরণ করা হয়েছে। এ জামে ও মুসনাদগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

(ক) সংকলনের নিয়ম অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় আকারে সাজানো।

(খ) রাসূল (ছাঃ)-এর কথার পাশাপাশি ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণের ফাতাওয়াও সংকলিত হয়েছে।

(গ) জারহ ও তা‘দীল পুরোদমে শুরু হয়।

(৬) হিজরী ৩য় শতাব্দীতে সংকলিত গ্রন্থসমূহ (২১০-৩১৫ হি.) :

হিজরী ৩য় শতাব্দীকে হাদীছ সংকলনের গোল্ডেন ইরা বা স্বর্ণযুগ বলা হয়। এই শতাব্দীতেই ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাঊদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে তিরমিযী ও সুনানে ইবনু মাজাহ সংকলিত হয়। এই ছয়টি জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ উম্মতে মুসলিমার মাঝে সীমাহীন গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং আজ অবধি ইলমে হাদীছের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই শতাব্দীতে সংকলিত প্রকাশিত-অপ্রকাশিত মিলে ড. আকরাম আল-উমারী প্রায় ৫০টি বইয়ের নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কুতুবে সিত্তাহ ব্যতীত বর্তমান যুগে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ অন্যান্য কয়েকটি বইয়ের নাম উল্লেখ করা হল-

- ‘মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা’। প্রকাশিত ও প্রসিদ্ধ।
- ‘মুসনাদ ইবনু আবি শায়বা’। প্রকাশিত।
- ‘মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক’। প্রকাশিত ও প্রসিদ্ধ।
- ‘মুসনাদ হুমায়দী’। প্রায় ১৪০০ হাদীছের সমাহার। প্রথম প্রকাশ পাকিস্তানের করাচী থেকে। বর্তমানে হাসান সালীম আসাদের তাহক্বীক্বে দিমাশক থেকে প্রকাশিত।

- ‘কিতাবুল ফিতান’, নু‘আইম ইবনে হাম্মাদ। প্রায় দুই হাযার হাদীছের সমাহার। ব্রিটেনের জাদুঘরে পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল। বর্তমানে কায়রো থেকে প্রকাশিত।
- ‘সুনানে সাঈদ ইবনে মানছূর’।
- ‘মুসনাদ ইবনুল জা‘দ’।
- ‘মুসনাদ ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ’। দামেশকের মাকতাবা যাহিরিয়্যাতে পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল। বর্তমানে প্রকাশিত।
- ‘জুয ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন’। দামেশকের মাকতাবা যাহিরিয়্যাতে পাণ্ডুলিপি আকারে আছে।
- ‘মুসনাদে আহমাদ’।
- ‘ফাযায়েলে ছাহাবা’, আহমাদ ইবনে হাম্বাল।
- ‘মুসনাদ আবদ ইবনে হুমায়দ’। ইরানের কাযবীন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল। বর্তমানে প্রকাশিত।
- ‘মারাসীল আবু দাঊদ’।
- ‘কিতাবুয-যুহদ’, ইমাম আবু দাঊদ।
- ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’, ইমাম বুখারী।
- ‘মুসনাদ বাযযার’।
- ‘ছহীহ ইবনু খুযায়মা’।
- ‘মুনতাক্বা ইবনিল জারূদ’।

৩য় শতাব্দীতে সংকলিত গ্রন্থগুলোর বৈশিষ্ট্য :

এই শতাব্দীতে হাদীছ সংকলন পূর্ণতা পায়। বে-হিসাব হাদীছ গ্রন্থ এই শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ হয়। এই শতাব্দীতে সংকলিত গ্রন্থগুলির অন্যতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল-

- শুধুমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সংকলিত হয়। ছাহাবী ও তাবেঈগণের ফাতাওয়া পৃথক করা হয়।
- আলাদাভাবে ছহীহ হাদীছ সংকলন করে গ্রন্থ লেখার প্রচলন শুরু হয়।
- বিভিন্ন মাসআলার উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ লেখা হয়।
- উসূলে হাদীছ ও জারাহ ওয়াত-তা‘দীলের মূলনীতি লিপিবদ্ধ হয়।
- রাবীদের জীবনী সংকলন করে কিতাব আকারে লিপিবদ্ধ হয়।

(৭) হিজরী ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে সংকলিত গ্রন্থসমূহ

Contents

প্রায় ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত হাদীছ সনদসহ মুহাদ্দিছগণ সংকলন করেন। খত্বীব বাগদাদী ও ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ)-কে এই ময়দানের শেষ সদস্য বলা যায়। তাঁদের পর সনদসহ হাদীছ বর্ণনা শেষ হয়ে যায়। এই দুই শতাব্দীতে সংকলিত গ্রন্থগুলোর অন্যতম হচ্ছে, ইমাম ত্বাবারানীর তিনটি মা'আজেম, ছহীহ ইবনু হিব্বান, মুস্তাদরাকে হাকেম, সুনানে বায়হাক্বী, সুনানে দারাকুত্বনীসহ অগণিত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়। যদিও অধিকাংশ হাদীছ তৃতীয় শতাব্দীতেই সংকলিত হয়ে গিয়েছিল। তারপরেও যা বাকী ছিল, তা ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে মুহাদ্দিছগণ সারা দুনিয়া থেকে চুষে নিয়ে নিজেদের গ্রন্থে জমা করেন। এই দুই শতাব্দীতে লিখিত গ্রন্থগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

(ক) রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের পাশাপাশি ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণের ফাতাওয়াও সংকলন করা হয়।

(খ) জারহ ও তা'দীল এবং মুছত্বলাহুল হাদীছ স্থায়ী ভিত্তি পায়।

এতদিন পর সংকলিত হাদীছগুলো কি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ?

এই প্রশ্নের প্রশান্তিদায়ক উত্তর আমরা কয়েকটি পয়েন্টের অধীনে দিব ইনশাআল্লাহ।

প্রথমত : মনে করুন! আপনি একজনকে জান-প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। তাকে আপনার জীবনের আদর্শ মনে করেন। তার জন্য জীবনও দিতে পারেন। তার নির্দেশে অনায়াসে জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। আপনার এই ভালবাসার ব্যক্তি আবার রাষ্ট্র প্রধান। হঠাৎ একদিন তিনি আপনার বাড়িতে উপস্থিত। আপনি তাকে জান-প্রাণ দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। রাতের অন্ধকারে শত্রুদের গুলিতে তিনি আহত হলেন। তাকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হল। আপনার সামনে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা কি কোনদিন ভুলবেন? এই ঘটনা স্মরণ রাখার জন্য আপনাকে কি খাতায় লিখে মুখস্থ করা লাগবে? অসম্ভব। বাস্তবতা এটাই যে, যাকে ভালবাসা হয় তার কথা এবং তার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা স্বভাবজাতভাবেই মনে থাকে। অন্যদিকে আর দশজনের কথার চেয়ে রাষ্ট্র প্রধান বা ক্ষমতাধর ব্যক্তির কথা বা তাদের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা মানুষের এমনিতেই মনে থাকে। এবার মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কথা ভাবুন! তাঁর প্রতি ছাহাবীদের ভালবাসার কথা স্মরণ করুন! তাঁর আনুগত্যের উপর তাদের জান্নাত-জাহান্নাম। তিনি তাদের রাষ্ট্র প্রধান। এক্ষণে তাদের চোখের সামনে রাসূল যদি কোন কাজ করেন, তারা কি তা ভুলবেন? তাদের কি এই ঘটনা স্মরণ রাখার জন্য খাতায় লিখে রাখার প্রয়োজন হবে?

দ্বিতীয়ত : ছাহাবীগণের আমল

একদিকে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ছাহাবীগণের এই রকম ভালবাসা ও রাসূল (ছাঃ)-এর বিভিন্ন ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী হওয়া, অন্যদিকে ছাহাবীগণের আমল। তারা রাসূলকে যা করতে দেখতেন, তাই করতেন। হুবহু পদাংক অনুসরণ করতেন। রাসুল যখন যেটা যেভাবে করেছেন, ছাহাবায়ে কেরাম হুবহু সেটাই সেভাবে করেছেন। তাদের অনুসরণের মাত্রা এত বেশী ছিল যে, ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা পাওয়া যায়,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي شَجَرَةً بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَيَقِيلُ تَحْتَهَا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি একটি গাছের নিকটে আসলেন এবং তার নীচে বিশ্রাম করলেন। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল এখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।[৫০]

তাহক্বীক্ব : সনদ ছহীহ।

যারা রাসূল (ছাঃ)-এর এভাবে অনুসরণ করেন, তাদের আবার হাদীছ লিখে রাখার প্রয়োজন আছে? সকাল-সন্ধ্যা যারা রাসূল (ছাঃ)-এর মত করে ৫ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন, তাদেরকে আবার ৫ ওয়াক্ত ছালাতের নিয়ম-কানূন লিখে রাখতে হবে মনে রাখার জন্য? কি সেলুকাস! কি বিচিত্র!

কোন জিনিস মুখস্থ করে রাখার চেয়ে তা বাস্তব অনুসরণ করলে বেশি মনে রাখা যায়। হজ্জের নিয়ম-কানূন হাদীছ থেকে শতবার মুখস্থ করলে যত মনে রাখা যাবে, সরাসরি সেই নিয়মে একবার হজ্জ করলে কোন দিন স্মৃতি থেকে হারাবে না। সুতরাং আমলের মাধ্যেম রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে জীবিত রেখে ছাহাবায়ে কেরাম রাসুলের হাদীছকে সংরক্ষণের সবচেয়ে বড় সফল কাজটি করেছেন। ফালিল্লাহিল হামদ।

তৃতীয়ত : আরবদের স্মৃতি শক্তি

আরবরা ঐতিহাসিকভাবে স্মৃতিশক্তির দিক দিয়ে প্রসিদ্ধ। তারা নিজেদের বংশনামার পাশাপাশি নিজেদের উটের বংশ পরম্পরাও মুখস্থ রাখত। যেহেতু তারা অশিক্ষিত ছিল, তাই তাদের বাস্তব জীবনের সবকিছু স্মৃতিশক্তি নির্ভর ছিল। হাযার হাযার, লাখ টাকার ব্যবসা তারা মৌখিক করত। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি একবার শুনেই ওমর রাবী'আর একটা কবিতা মুখস্থ করে নিয়েছিলেন।[৫১]

৫০. মুসনাদে বাযযার হা/৫৯০৯।
৫১. জামি'উল উলূম, ইবনু আব্দিল বার ১/২৪৯।

আমি এই কবিতার লাইন গুণে দেখেছি। ১৫০ লাইনের বিরাট কবিতা। এভাবেই তারা হাযার হাযার কবিতা, বংশের ব্যক্তিদের নাম ও গুণাবলী, উটের বংশের নাম ও গুণাবলী, ব্যবসা বাণিজ্যের হিসাব সবকিছু স্মৃতিতে ধরে রাখত। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার বংশ বিশেষজ্ঞ ছিল। যারা নিজের বংশের পাশাপাশি সকল গোত্রের বংশতালিকা গুণাবলীসহ মুখস্থ রাখত। শুধু গোত্রদের বংশতালিকা নয়; বিভিন্ন গোত্রের উটের বংশতালিকাও মুখস্থ রাখত। আরবদের স্মৃতি শক্তির উদাহরণ ইমাম ইবনু শিহাব যুহরী (রহঃ)-এর কথা থেকে পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

إِنِّي لَأَمُرُّ بِالْبَقِيعِ فَأَسُدُّ آذَانِي مَخَافَةَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْخَنَا فَوَ اللهِ مَا دَخَلَ أُذُنِي شَيْءٌ قَطُّ فَنَسِيتُهُ.

‘আমি যখন বাক্বী কবরস্থান অতিক্রম করি, তখন আমার কান বন্ধ করে নিই এই ভয়ে যে, তাতে মন্দ জিনিস প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর কসম! আমার কান দিয়ে যাই প্রবেশ করেছে, আমি তা ভুলিনি’।[৫২]

আজও আরব বিশ্বে এমন আলেম ও ছাত্র পাওয়া যায় পবিত্র কুরআন ও কুতুবে সিত্তাহ যাদের শুধু মুখস্থ নয়, ঠোঁটস্থ।

চতুর্থত : রাষ্ট্রীয় ড্যামোচিত্র

ইঞ্জিনিয়ারের করা প্লান এবং বাস্তব বিল্ডিং-এর মধ্যে যদি বাস্তব বিল্ডিং তৈরী হয়ে যায়, তাহলে ইঞ্জিয়ারের প্লান হারিয়ে গেলেও যে কেউ ঐ বিল্ডিং দেখে হাযার বার প্লানের ড্যামোচিত্র তৈরি করতে পারবে। রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের ভাণ্ডার ছিল ইসলামী সমাজের আল্লাহ প্রদত্ত প্লানের চিত্র। আলহামদুলিল্লাহ! রাসূল (ছাঃ) সেই প্লান সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যামানা পর্যন্ত সেই প্লান পূর্ণ রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হয়ে এসেছে। ফিতনা বহিঃপ্রকাশের পর ছাহাবীগণের ব্যক্তিজীবনে তা পালিত হয়ে এসেছে। সুতরাং বলা যায়, ৪০ হিজরী পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং ১০০ হিজরী পর্যন্ত ছাহাবীগণের ব্যক্তিজীবনে রাসূলের হাদীছ অটোমেটিক সংরক্ষিত হয়ে থেকেছে। ফালিল্লাহিল হামদ।

রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ নিশ্চিতভাবে সুরক্ষিত

প্রাচ্যবিদসহ হাদীছ অস্বীকারকারীরা নিজেদের অজান্তেই হোক বা সজ্ঞানে হোক একটি ভ্রান্ত ধারনায় ভুগেন। তারা মনে করে হাদীছের ভাণ্ডার মানে রাসুলের

৫২. প্রগুপ্ত।

কথা, যা সংরক্ষণের জন্য লেখা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। অথচ হাদীছের ভাণ্ডারের দুই তৃতীয়াংশ রাসূল (ছাঃ)-এর কাজ। বাকী একভাগ রাসূল (ছাঃ)-এর মুখ নিঃসৃত বাণী। আমরা উপরের আলোচনায় স্পষ্ট দেখেছি যে, রাসূল (ছাঃ)-এর কাজ ছাহাবীগণের মুখস্থ করার দরকার নেই। চাক্ষুষ সাক্ষী হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই তা মনে থাকবে। বাকী একভাগ রাসূল (ছাঃ)-এর যে মৌখিক হাদীছ আছে, ছাহাবায়ে কেরাম তা ব্যক্তিগত আমলের মাধ্যমে ১০০ বছর যাবত এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ৪০ বছর যাবত অটোমেটিক সংরক্ষিত রেখেছেন। বাকী একেকটু যা ছিল, তা তারা তাদের তুখোড় আরবীয় স্মৃতিশক্তির উপর ভিত্তি করে অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষণ করেছেন। পাশাপাশি হাদীছ লিপিবদ্ধ করার প্রচলন রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল। ছাহাবীগণের যুগে তা আরো বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তুখোড় স্মৃতি শক্তি, দারস-তাদরীস, আমল ও লিখে রাখার মাধ্যমে ছাহাবায়ে কেরাম নিশ্চিতভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ পূর্ণরূপে অক্ষতভাবে সংরক্ষণ করেছিলেন। অতএব, আমাদের সামনে উপস্থিত ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের হাদীছ যে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ এতে কোন সন্দেহ নেই।

মুহাদ্দিছগণের হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের পদ্ধতি সংক্রান্ত অভিযোগ ও তার জবাব

মুহাদ্দিছগণের তাহক্বীক্বের উপর হাদীছ অস্বীকারকারী বা হাদীছে সন্দেহ সৃষ্টিকারীদের মূল অভিযোগগুলি হচ্ছে-

(ক) তারা শুধু সনদ তাহক্বীক্ব করেন, 'মত্ন' বা মূল টেক্সট নয়।

(খ) তাদের যাবতীয় মূলনীতির ভিত্তি রাবীর ন্যায়পরায়ণতা ও স্মৃতিশক্তির উপর, অথচ একজন মিথ্যুকও সত্য বলে এবং মযবূত স্মৃতিশক্তির অধিকারী মানুষও ভুল করে।

(গ) তারা ডাক্তারের কম্পাউন্ডারের মত। কোন্ ঔষধ কোথায় আছে, তা বলতে পারবেন, কিন্তু কোন্ ঔষুধ কোন্ অসুখের জন্য, তা বলতে পারবেন না। তাদের কাছে ঔষধের ভাণ্ডার আছে, কিন্তু প্রেসক্রিপশন লেখার মত যোগ্যতা নেই।

উক্ত অভিযোগগুলির জবাব নিম্নে প্রদান করা হল-

মুহাদ্দিছগণের মূলনীতি শতভাগ যৌক্তিক :

আপনার নিকট কেউ একজন ফোন করে বলল, আপনার সন্তান এক্সিডেন্ট করেছে। অমুক মেডিক্যালে আছে। আপনি এই মুহূর্তে রাজশাহীতে আছেন এবং আপনার সন্তান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। ফোনে যে আপনাকে খবরটি

দিল, আপনি তাকে চিনেন না। খবরটি পাওয়ার পর সর্বপ্রথম আপনি কি করবেন? অবশ্যই খবরটি সত্য কিনা জানতে চাইবেন। সত্য জানার জন্য এমন একজন ব্যক্তিকে আপনি ফোন করবেন, যাকে আপনি বিশ্বাস করেন। যে সত্য বলে। আপনাকে ও আপনার পরিবারকে ভালবাসে। সে যদি জানায় এক্সিডেন্ট করেনি, তাহলে আপনি ২য় আর কারো নিকট ফোন দেওয়ার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করবেন না। বরং নিশ্চিন্ত মনে রাতে ঘুম দিবেন। আর যদি সে বলে, হ্যাঁ, এক্সিডেন্ট করেছে। তাহলে আপনি সাথে সাথে ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে ঢাকার বাসে চেপে বসবেন। সে যদি বলে, তাকে আরেকজন এই খবরটা দিয়েছে। তাহলে আপনি সাথে সাথে দেখবেন তাকে খবরদানকারী কে? খবরদানকারী যদি তার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হন, আপনি সাথে সাথে বিশ্বাস করবেন। যদি না চিনতে পারেন, তাহলে খবরদানকারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, তার সম্পর্কে জানতে চাইবেন। এভাবে সত্য জানার চেষ্টা করা মানুষের স্বভাবজাত। এটাই মানব জীবনের বাস্তবতা। মানুষের ভাল-মন্দের উপর ভিত্তি করে সংবাদের সত্যতা নির্ণয় করার এ পদ্ধতি শতভাগ যৌক্তিক। আদিকাল থেকে চলে আসা জীবন ঘনিষ্ঠ মূলনীতি।

আজও গোয়েন্দা তথ্যের উপর ভিত্তি করে সেনাবাহিনী হামলা চালায়। কেন? তার গোয়েন্দারা তাকে মিথ্যা তথ্য দিতে পারে না তাই। এই রকম তথ্যের ভিত্তিতে হামলা চালিয়ে কত যুদ্ধে কত নেতা বিজয়ী হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কত দেশ তামা-তামা হয়ে গেছে, তার হিসাব নেই। যুগ যুগ থেকে চলে আসছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

মুহাদ্দিছগণও রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ যাচাই-বাছাই করার জন্য চিরস্বীকৃত এই পথটিকেই অবলম্বন করেছেন। শুধু তাই নায়, মুহাদ্দিছগণ হাদীছ গ্রহণের জন্য সত্যবাদিতার পাশাপাশি আরো কয়েকটি বিষয়কে সামনে রাখেন। রাবীর স্মৃতিশক্তি যাচাই করেন। স্মৃতিশক্তি যাচাই করার জন্য তারা রাবীদের পরীক্ষা গ্রহন করেন। একজন ছাহাবীর ৫০ জন ছাত্র হলে মুহাদ্দিছগণ ৫০ জন ছাত্রের সকল হাদীছ জমা করে পরস্পরের হাদীছের সাথে মিলিয়ে দেখেন। হাদীছ বর্ণনায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি মুহাদ্দিছগণ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন। মুহাদ্দিছগণের নির্ধারিত ন্যায়পরায়ণতা ও স্মৃতিশক্তির শর্ত এতটাই উঁচু মানের যে, তার ফাঁক গলিয়ে কোন ভুল বা মিথ্যা হাদীছ ইসলামে প্রবেশ করবে তার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। সত্যি বলতে কি মুহাদ্দিছগণের শর্ত পূরণ করতে পারবে এই রকম মানুষ বর্তমান দুনিয়াতে ভিনগ্রহের প্রাণীর মত। যাদের মুখে দাড়ি নেই, যারা রাত-দিন নগ্নতা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কথায় কথায় মিথ্যা বলে, তাদের দিকে ঘৃণাভারে মুহাদ্দিছগণ দৃষ্টি তুলেও তাকান না। মুহাদ্দিছগণ তো বাজারে

বসে গল্প-গুজব করা, আড্ডা দেয়াকে একজন রাবীর জন্য ত্রুটি মনে করেন। রাতে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় না করলে ছাত্রকে হাদীছ শুনানোর যোগ্য মনে করেন না। মুহাদ্দিছগণের এসব উঁচু শর্তের দিকে তাকালে দুনিয়ার অতি মহান ব্যক্তিদের মনে হবে তারাও এই শর্তে টিকবেন না। আইনস্টাইন, নিউটন এদের মত মহা বিজ্ঞানীরাও মুহাদ্দিছগণের শর্তে ফেল করবেন। আর যে সমস্ত প্রাচ্যবিদরা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তাদের কথা না হয় নাই বললাম।

এত কড়া শর্তের পরেও মুহাদ্দিছগণ শুধু রাবীদের ন্যায়পরায়ণতা ও স্মৃতিশক্তিকে যথেষ্ট মনে করেন নি। রাবী তার শিক্ষক থেকে শুনেছেন কিনা এটাও নিশ্চিত হতে হবে। অনেক সময় রাবী অতি ন্যায়পরায়ণ ও অতি স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন হওয়ার পরেও কোন কারণে শিক্ষকের নাম গোপন করেন। মুহাদ্দিছগণ এই কমতিটুকুও বরদাশত করেন নি। তারা ওই গোপন শিক্ষকের ন্যায়পরায়ণতা ও স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে জানতে চান। এজন্য সনদ সংযুক্ত না বিচ্ছিন্ন তার গুরুত্ব মুহাদ্দিছগণের নিকট সীমাহীন। শুধু তাই নয়, রাবী যদি অনেক বড় ইমাম হন এবং নিজের শিক্ষকের নাম উল্লেখ না করেই বলেন আমার শিক্ষক ন্যায়পরায়ণ ও মযবূত। মুহাদ্দিছগণ এই সাফাইকেও যথেষ্ট মনে করেন না। আল্লাহু আকবার!

মুহাদ্দিছগণ রাবীদের হাদীছ বর্ণনায় ব্যবহৃত শব্দগুলোর পার্থক্যও হুবহু বজায় রাখেন। যেমন, একজন রাবী বললেন, আমি শুনেছি। তাহলে মুহাদ্দিছগণ এই শুনেছি শব্দের জায়গায় 'আমাকে বলা হয়েছে' এই পরিবর্তনটুকুও সহ্য করেন না। হাদীছের সনদের এভাবে অণু থেকে অণু বিশ্লেষণ করার পরেও তারা একটা হাদীছকে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ বলে হুকুম আরোপ করেন না। বলেন না যে, এ হাদীছ ছহীহ। এই দীর্ঘ বিশ্লেষণের পর তারা শুধু এ হাদীছের সনদকে ছহীহ বলে মন্তব্য করেন। তাদের মন্তব্যের ক্ষেত্রে ভাষার পার্থক্য দেখুন! হাদীছ ছহীহ এবং হাদীছের সনদ ছহীহ। হাদীছকে ছহীহ বলার জন্য এখনো তাদের দু'টি শর্ত বাকী আছে। এ হাদীছটি যেন 'শায' না হয় এবং এ হাদীছের মধ্যে যেন কোন 'ইল্লাত' না থাকে। এই দু'টি শর্তের উপর নীচে আলোচনা করা হল।

সনদ বনাম মত্ন

প্রাচ্যবিদ গ্যাষ্টন ওয়াট, গোল্ড যিহের এবং নামধারী কিছু মুসলিম পণ্ডিত মুহাদ্দিছগণের উপর ডাহা মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করেছেন যে, তারা শুধুমাত্র হাদীছের সনদ দেখে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, হাদীছের মত্ন বা মূল টেক্সট দেখেন না। তাদের এই উদ্ভট অভিযোগের জবাব নিম্নে প্রদত্ত হল-

(ক) সত্যি বলতে কি প্রাচ্যবিদদের দাবীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সনদ বিশ্লেষণ করার কোন দরকার নেই। শুধু মূল টেক্সট বিশ্লেষণ করতে হবে। বিশ্লেষণের মাধ্যম হবে প্রত্যেক গবেষকের বিশেষ চিন্তা শক্তি। তাদের এই মন্তব্যের পিছনে লুকিয়ে আছে হাদীছের ভাণ্ডারকে ধ্বংস করার নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র। কেননা প্রতিটি মানুষ আলাদা চিন্তা শক্তি নিয়ে জন্ম নেয়। সকল গবেষকের চিন্তা শক্তিকে কোন মূলনীতি ছাড়াই স্বাধীনতা দেয়া হলে যার যা মনে লাগবে সে তেমন বলবে। হাযার বছরের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে হাদীছের ভাণ্ডার আজ যে মযবূত জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আছে, তা ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবন বাজি রেখে হাযার-হাযার মাইল সফর করে আমাদের সালাফ মুহাদ্দিছগণ যে হাযার হাযার হাদীছ ও লক্ষ লক্ষ রাবীগণের জীবনী সংরক্ষণ করেছেন, তা নিমিষেই অচল ও অকেজো হয়ে যাবে। আর প্রাচ্যবিদরা তো এটাই চায়।

(খ) মুহাদ্দিছগণ মত্ন বিশ্লেষণ করেন না এটা একটা ডাহা মিথ্যা অভিযোগ। হাদীছ ছহীহ হওয়ার জন্য মুহাদ্দিছগণ ৫টি শর্ত আরোপ করেছেন। যথা-

(১) রাবী ন্যায়পরায়ণ হওয়া।
(২) স্মৃতিশক্তি মযবূত হওয়া।
(৩) সনদ মুত্তাছিল হওয়া তথা সনদে বিচ্ছিন্নতা না থাকা।
(৪) হাদীছ ‘শায’ না হওয়া।
(৫) হাদীছে কোন গোপন ‘ইল্লাত’ না থাকা।

শেষ শর্ত দু’টি তথা ইল্লাত না থাকা ও শায না হওয়া যেমন সনদ সংশ্লিষ্ট, তেমনি মত্ন বা মূল টেক্সট সংশ্লিষ্ট। একজন মুহাদ্দিছ তার নিজস্ব বিশেষ গবেষণাধর্মী চিন্তা ধারা দিয়ে হাদীছের তাত্ত্বিক ও ফলিত তাৎপর্য নির্ণয়ের মাধ্যমে ইল্লাত বের করেন। ইল্লাত বের করার জন্য তারা কয়েকটি উপায় অবলম্বন করেন।

(১) হাদীছের সকল সনদ জমা করতঃ সকল সনদে বর্ণিত মূল টেক্সটগুলোর তুলনামূলক পর্যালোচনা করেন।
(২) ইসলামের অন্যান্য হুকুম-আহকামের সাথে তুলনামুলক বিচার করা।
(৩) হাদীছের মূল টেক্সটের শব্দমালার ব্যুৎপত্তির উপর গবেষণা করতঃ সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করা এই শব্দগুলো রাসূল (ছাঃ)-এর কিনা?

যেমন, মনে করুন! ইবনু শিহাব যুহরি খুব বড় মাপের একজন মুহাদ্দিছ। তাঁর বর্ণিত হাদীছ ছহীহ হবে। ইমাম বুখারী (রহঃ) বা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহঃ) প্রমুখের মত হাফেযে হাদীছগণের ইবনু শিহাব যুহরি থেকে বর্ণিত প্রায়

সব হাদীছ জানা আছে। তিনি কেমন হাদীছ বর্ণনা করেন? কোন্ কোন্ তাবেঈ বা কোন্ কোন্ ছাহাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন? এবং তাঁর কাছ থেকে কে কে হাদীছ বর্ণনা করেন? যারা হাদীছ বর্ণনা করেন, তারা তাঁর কাছে কত দিন থেকেছেন? এই সমস্ত হাদীছ বর্ণনা কারীদের ক্লাসফ্রেন্ড তথা তাদের সাথী কে কে? সবকিছুই তাদের জানা আছে। অন্যদিকে রাসুল (ছাঃ)-এর হাযার-হাযার হাদীছ পড়ে এবং মুখস্থ করে তাদের একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে যে, রাসুল (ছাঃ)-এর হাদীছের শব্দ এই রকম হয়। এখন এমন একটা হাদীছ তারা পেলেন, যা ইবনু শিহাব যুহরি (রহঃ) বর্ণনা করছেন, কিন্তু এমন ছাহাবী থেকে, যার কাছ থেকে সাধারণতঃ তিনি বর্ণনা করেন না। আবার তার কাছ থেকে শুধুমাত্র একজন ছাত্র হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ঐ ছাত্রের অন্য কোন সাথী হাদীছটি বর্ণনা করেননি এবং তারা জানেনও না যে ইবনু শিহাব যুহরি (রহঃ) এই ধরনের হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অন্য দিকে হাদীছের শব্দ এমন, যা দেখে মনে হচ্ছে, রাসুল (ছাঃ) এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করেন না। তখন মুহাদ্দিছগণ বলেন, এই হাদীছের মধ্যে 'ইল্লাত' আছে, এজন্য হাদিছটি ছহীহ নয়।

সুতরাং একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুহাদ্দিছগণ হাদীছের সনদ ও মূল টেক্সট উভয়টি নিয়ে গবেষণা করেই হাদীছকে ছহীহ বলেন।

(গ) মুহাদ্দিছগণ হাদীছের মত্ন বা মূল টেক্সট যাচাই-বাছাই করেন না এটা যে ডাহা মিথ্যা অভিযোগ তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, মাক্ববূল বা গ্রহণযোগ্য হাদীছের দু'টি প্রকার- ছহীহ লি-গাইরিহি ও হাসান লি-গইরিহি। যে কোন উছূলে হাদীছের কিতাবে এ প্রকার দু'টি পাওয়া যাবে। মুহাদ্দিছগণ এই দুই প্রকারের ছহীহ হাদীছ নির্ণয় করে থাকেন শুধু মূল টেক্সটের উপর ভিত্তি করে।

এ আলোচনায় ইলমে হাদীছ ও মুহাদ্দিছগণের হাদীছ তাহক্বীক্বের ধরনের হালকা নমুনা পেশ করা হয়েছে। সত্যি বলতে কি! ইলমে হাদীছ এমন এক সাগর যার কোন কিনারা নেই। আর যাদের উপদেশ গ্রহণের মানসিকতা আছে, তাদের জন্য একটি দলীলই যথেষ্ট হয়ে যায়।

রাবী ও হাদীছের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি নিরসন

আমরা শুনে থাকি, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল ১০ লক্ষ হাদীছের হাফেয ছিলেন। ইমাম বুখারী ৬ লক্ষ হাদীছ থেকে তাঁর ছহীহ বুখারী সংকলন করেন। এই জাতীয় কথাকে ভিত্তি বানিয়ে প্রাচ্যবিদরারা অভিযোগ উত্থাপন করে থাকেন, একজন মানুষ ২৩ বছরে এত কথা কিভাবে বলতে পারে? তেমনি আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর ক্ষেত্রেও একই অভিযোগ উত্থাপন করা হয়।

সত্যি বলতে কি ইলমে হাদীছ সম্পর্কে অজ্ঞতাই এই অভিযোগগুলোর কারণ। রাসূল (ছাঃ)-এর সকল হাদীছ তার কথা নয়। বরং তার কাজ এবং মৌনসম্মতি এমনকি তার শারীরিক গঠন সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছকেও হাদীছ বলা হয়। হাদীছের ভাণ্ডারের তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর কথা। অন্যদিকে হাদীছের মূল টেক্সট একটি হলেও সনদ হয় অগণিত। রাসূল থেকে দশ জন ছাহাবী শুনেছেন। দশ জন ছাহাবী থেকে বিভিন্ন সময়ে ১০০ জন তাবেঈ হাদীছটি শুনেছেন। ১০০ জন তাবেঈ থেকে ইমাম মালেক হাদীছটি শুনেছেন। এভাবে ইমাম মালেক পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে হাদীছের সনদ অনেক হয়ে গেছে। আর মুহাদ্দিছগণের নিয়ম হচ্ছে, একটি হাদীছের সনদ যদি ১০টি হয়, তাহলে তারা তাকে ১০টি হাদীছ বলে থাকেন। সনদের উপর ভিত্তি করে তারা হাদীছ গণনা করে থাকেন। এ দু'টি বিষয়ে অজ্ঞতার কারণেই মূলতঃ এই উদ্ভট অভিযোগ উত্থাপন করা হয়।

অন্যদিকে প্রাচ্যবিদরা আরেকটি উদ্ভট অভিযোগ উত্থাপন করে থাকেন। মযবূত রাবীও ভুল করতে পারেন। মিথ্যুক রাবীও সত্য বলতে পারেন। সুতরাং শুধু সনদের উপর নির্ভর করে হাদীছ তাহক্বীক্ব করার মুহাদ্দিছগণের মূলনীতি অযৌক্তিক। আমরা প্রথমেই স্পষ্ট করেছি শুধু সনদ দেখে হাদীছ তাহক্বীক্ব করার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তারপরেও তাদের এ নির্দিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে আমরা স্পষ্ট করতে চাই। মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে। এটা চিরন্তন সত্য। এই সম্ভাবনাকে ভিত্তি বানানো হলে পুরো দুনিয়া অচল হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ এটা জানা সত্ত্বেও আমাদের নিকট মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, ফেরেশতাকে নয়। এই সম্ভাবনাকে সামনে রেখে কেউ ঘরে বসে নেই। সবাই কাজ করছে। সফল হচ্ছে। ফল পাচ্ছে। সুতরাং এই সম্ভাবনাকে ভিত্তি বানানো উদ্ভট মস্তিষ্কের সৃষ্টি বৈ কিছু নয়। যে ভাল খেলে, সে মাঝে-মধ্যে ভুল করলেও মানুষ তার ভাল খেলার উপর ভরসা রাখে। যে ডাক্তার ভাল চিকিৎসা করে, মানুষ তার কাছেই যায় অথচ সেও ভুল করতে পারে। অনুরূপভাবে মানব জীবনের সকল শাখায় যার মধ্যে যে জিনিসটার আধিক্য রয়েছে, যোগ্যতা রয়েছে সে বিষয়ে তার উপরেই ভরসা করা হয়। কোন সময় বলা হয় না, সেও তো ভুল করতে পারে। যদি এই ভুলের সম্ভাবনা সর্বক্ষেত্রে সৃষ্টি করা হয়, তাহলে যারা হাদীছের উপর এই অভিযোগ উত্থাপন করছে, তাদের ক্ষেত্রেও একই অভিযোগ সৃষ্টি হবে। তারাও তো এই অভিযোগ উত্থাপনের ক্ষেত্রে ভুল করতে পারে। বিবেকবানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

ইলমে হাদীছ ‘ইলমে ইলহামী’

মুহাদ্দিছগণের জামা‘আত মহান আল্লাহর চয়নকৃত জামা‘আত। মহান আল্লাহ তার রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে সংরক্ষণের জন্য মুহাদ্দিছগণকে বাছাই করেছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর লক্ষ লক্ষ হাদীছ মুখস্থ করার ফলে তাঁদের ভিতরে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের উপর যে অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয়, তা দিয়ে তারা হাদীছ শুনলেই বুঝতে পারেন হাদীছ ছহীহ কিনা। সাথে থাকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম। যেমন আবু যুর‘আ (রহঃ) (১৯৪-২৬৪হিঃ) থেকে বর্ণিত,

قَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا الْحُجَّةُ فِي تَعْلِيلِكُمُ الْحَدِيثَ قَالَ الْحُجَّةُ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لَهُ عِلَّةٌ فَأَذْكُرُ عِلَّتَهُ ثُمَّ تَقْصِدُ ابْنَ وَارَةَ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ وَتَسْأَلُهُ عَنْهُ وَلَا تُخْبِرُهُ بِأَنَّكَ قَدْ سَأَلْتَنِي عَنْهُ فَيَذْكُرُ عِلَّتَهُ، ثُمَّ تَقْصِدُ أَبَا حَاتِمٍ فَيُعَلِّلُهُ ثُمَّ تُمَيِّزُ كَلَامَ كُلِّ مِنَّا عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَإِنْ وَجَدْتَ بَيْنَنَا خِلَافًا فِي عِلَّتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ كُلًّا مِنَّا تَكَلَّمَ عَلَى مُرَادِهِ وَإِنْ وَجَدْتَ الْكَلِمَةَ مُتَّفِقَةً فَاعْلَمْ حَقِيقَةَ هَذَا الْعِلْمِ قَالَ فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَاتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ إِلْهَامٌ.

একদা তাঁকে একজন ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হাদীছের ত্রুটি বর্ণনার ক্ষেত্রে আপনাদের দলীল কি? তখন তিনি জবাবে বলেন, তুমি আমাকে এমন এক হাদীছ জিজ্ঞেস কর, যাতে ত্রুটি আছে। আমি তোমাকে ত্রুটি বলে দিব। তারপর তুমি মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিমের নিকট গিয়ে তাকেও একই প্রশ্ন করবে। আর তাকে জানাবে না যে, তুমি আমাকে এই প্রশ্ন করেছ। সে তোমাকে হাদীছের ত্রুটি জানাবে। অতঃপর তুমি আবু হাতিমের নিকট যাবে সেও তোমাকে হাদীছের ত্রুটি জানাবে। অতঃপর তুমি এই হাদীছের উপর সকলের মন্তব্যের মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করবে। যদি দেখ আমরা সবাই ত্রুটি বিষয়ে আলাদা মন্তব্য করেছি, তাহলে বুঝবে আমরা সবাই নিজ নিজ উদ্দেশ্যে কথা বলেছি। আর যদি দেখ সকলের মন্তব্য এক, তাহলে এই ইলমের বাস্তবতা বুঝে নিও! লোকটি পরীক্ষা করে দেখল তাদের সকলের মন্তব্য এক। তখন ব্যক্তিটি বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় এই জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত ইলহাম।[৫৩]

তাইতো আমরা দেখি, ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ) তাঁর ছহীহ বুখারী লেখার পর যুগের সেরা তিন জন মুহাদ্দিছ ইমাম আহমাদ (মৃঃ ২৪১হিঃ), ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মা‘ঈন (মৃঃ ২৩৩ হিঃ) ও ইমাম আলী ইবনে মাদীনীর (মৃঃ ২৩৪ হিঃ) নিকট তাঁর বই পেশ করেন। তাঁরা সকলেই তাঁর বইয়ের প্রায় ৭ হাযার হাদীছকে ছহীহ বলে স্বীকৃতি প্রদান করেন। মাত্র ৪টি হাদীছ ব্যতীত।

৫৩. মা‘রেফাতু উলূমিল হাদীছ, ইমাম হাকিম ১/১১৩; আল-জামি লি আখলাকির-রাবী, খত্বীব বাগদাদী হা/১৮০১।

ইমাম উকাঈলী (মৃঃ ৩২২ হিঃ) বলেন, এ ৪টি হাদীছের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারীর কথাই ঠিক।[৫৪]

এজন্যই সুফিয়ান (রহঃ) বলেন, وجل أحدا يكذب فِي الحَدِيث مَا ستر الله عز 'মহান আল্লাহ এমন কোন মিথ্যুককে গোপন রাখেন নি, যে মুহাদ্দিছগণের নিকট ধরা পড়েনি'।[৫৫] এটা নিতান্তই মহান আল্লাহর সেই ওয়াদার বাস্তবায়ন, যা তিনি পবিত্র কুরআনে করেছেন।

ফক্বীহ বনাম মুহাদ্দিছ

মুহাদ্দিছগণ ফিক্বহী জ্ঞান রাখেন না এই জাতীয় মন্তব্য ভিত্তিহীন। আমরা জানি পৃথিবী বিখ্যাত ফকীহ হচ্ছেন ৪ জন। ইমাম নু'মান ইবনে ছাবিত আবু হানীফা (রহঃ) (মৃঃ ১৫০ হিঃ), ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস শাফেঈ (রহঃ) (মৃঃ ২০৪ হিঃ), ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহঃ) (মৃঃ ১৭৯ হিঃ) এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহঃ) (মৃঃ ২৪১হিঃ)।

এই ৪ জন বিখ্যাত মুজতাহিদ ফক্বীহের মধ্যে তিনজনই নিজ নিজ যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ হিসেবে পরিচিত। আজও তাদের পরিচিতি যতটা না তাঁদের ফিক্বহের জন্য, তার চেয়ে বেশী তাদের হাদীছের খিদমতের জন্য। তারাই জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করেন যে, মুহাদ্দিছগণ ফক্বীহ।

স্বয়ং দারুল উলুম দেওবান্দে উস্তায মুফতী সাঈদ আহমাদ পালানপুরী 'হাদীছ আওর আহলে হাদীছ' কিতাবের ভূমিকায় বলেছেন ফক্বীহগণ দুই প্রকার। আহলে হাদীছ ফক্বীহ ও আহলুর রায় ফক্বীহ।[৫৬]

মুহাদ্দিছগণ সম্পর্কে বিখ্যাত হানাফী আলেম আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহঃ)-এর একটি মন্তব্যই যথেষ্ট। তিনি বলেন,

ومن نظر بنظر الإنصاف وغاص في بحار الفقه والأصول، متجنباً عن الإعتساف يعلم علما يقيناً أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبا من الإنصاف فلله دَرُّهُم كيف لا وهم ورثة النبي حقاً ونُوَّاب شرعه صدقاً.

৫৪. ফাতহুল বারী, ইবনু হাজার ১/৭।
৫৫. মাওযূ'আত, ইবনুল-জাওযী, ১/৪৮।
৫৬. হাদীছ আওর আহলে হাদীছ, ভূমিকা।

'আর যে ব্যক্তি গোড়ামী থেকে দূরে থেকে ইনছাফের দৃষ্টিতে দেখবে এবং ফিক্বহ ও উছূলে ফিক্বহের সাগরে ডুব দিবে, সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে, শাখাগত ও মৌলিক যে সমস্ত মাসআলায় উলামায়ে কেরাম ইখতিলাফ করেছেন, তাতে অন্যদের তুলনায় মুহাদ্দিছগণের মাযহাবই বেশী মযবূত। আর আমি যতবার মতভেদপূর্ণ মাসআলাগুলো গবেষণা করেছি, ততবার মুহাদ্দিছগণের মন্তব্যকে ইনছাফের সবচেয়ে নিকটে পেয়েছি। তারা কতইনা মহান! আর কেনইবা হবে না, তারাই তো মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর প্রকৃত উত্তরসূরী এবং তার শরী'আতের সত্যিকার প্রতিনিধিত্বকারী।[৫৭]

প্রাচ্যবিদ ও রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ

প্রাচ্যবিদদের পরিচয় :

প্রাচ্যবিদ শব্দটি আরবী 'মুস্তাশরিক্ব' (المستشرق) শব্দের বাংলা অনুবাদ। মুস্তাশরিক শব্দটি শারক থেকে নির্গত। শারক অর্থ পূর্ব। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হল Orientalist। এশিয়া মহাদেশ পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় তাকে প্রাচ্য বলা হয়। অন্যদিকে পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত দেশগুলোকে পাশ্চাত্য বলা হয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তিনটি ধর্মের তিনটিরই জন্মভূমি প্রাচ্য। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর প্রাচ্যে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে। ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধর্ম পাশ্চাত্যে টিকে থাকে। পাশ্চাত্যের অধিবাসী হওয়ার পরেও যারা প্রাচ্য নিয়ে গবেষণা করে, তাদেরকে প্রাচ্যবিদ বলা হয়। যেহেতু প্রাচ্যে ইসলামের আধিক্য বেশী, সেহেতু যারা অন্য ধর্মের হওয়ার পরেও ইসলামের ভাষা ও কুরআন-হাদীছ নিয়ে গবেষণা করে তাদেরকে প্রাচ্যবিদ বলা হয়।

মুসলিমদের ইলমী কেন্দ্র ছিল দু'টি। বাগদাদ ও গ্রানাডা। পৃথিবীর জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতি মুসলিমদের হাতেই হয়। কথিত আছে, যে সময় গ্রানাডার রাস্তায় লাইট জ্বলত, তখন ইউরোপের মানুষ মানবিক প্রয়োজন সারার জন্য জঙ্গলে যেত। বাগদাদের পতন হয় মঙ্গোলিয়াদের হাতে। লাখ-লাখ কিতাব তারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। স্পেনের পতন হয় খ্রিষ্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ডের হাতে। তারা মুসলিমদের লক্ষ লক্ষ বই-পুস্তক সব চুরি করে নিয়ে যায় ইউরোপে। তেমনিভাবে ক্রুসেডাররাও হাযার-লাখ বই-পুস্তক চুরি করে নিয়ে যায় ইউরোপে। আজও অনেক দুর্লভ বইয়ের পাণ্ডুলিপি লন্ডন ও ইউরোপের লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যায়। চুরি করে নিয়ে যাওয়া এই বইগুলির উপর তারা গবেষণা শুরু করে। এই গবেষণা থেকেই তারা ধীরে ধীরে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নতি

৫৭. ইমামুল কালাম ২১৬ পৃঃ।

লাভ করতে থাকে। আজকে পাশ্চাত্য বিশ্ব যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, তার পিছনে মূলতঃ মুসলিমদের অবদান। তারা যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে যেতে থাকে তেমনি ইসলাম নিয়েও পড়াশোনা চালাতে থাকে। পর্যায়ক্রমে ১৬৩২ খ্রিঃ সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৬৩৮ খ্রিঃ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ডিপার্টমেন্ট চালু করা হয়। এইভাবে ইসলাম নিয়ে তাদের যাত্রা অব্যাহত থাকে। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গোল্ড যিহর, এইচ.এ.আর. গিব, গ্যাষ্টন ওয়াট প্রমুখ।

প্রাচ্যবিদদের উদ্ভট কিছু অভিযোগ ও তার জবাব :

প্রাচ্যবিদদের গবেষণার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল হাদীছের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টির চোরাগলি খুঁজে বের করা। তারা তাদের চেষ্টায় সফলও বলা যায়। তবে মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে তাদের সকল উদ্ভট যুক্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন মুহাদ্দিছগণ। তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন, শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াহ্ইয়া আল-মু'আল্লিমী (রহঃ)। তাদের অভিযোগগুলোর ভিত্তি মূলতঃ কয়েকটি অভিযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেগুলি হচ্ছে-

(ক) আবু হুরায়রা (রাঃ) মিথ্যুক (না'ঊযুবিল্লাহ)।
(খ) ছাহাবীগণের মধ্যে অনেকেই মুনাফিক্ব ছিলেন। তারা যে রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা হাদীছ বানিয়ে চালিয়ে দেননি তার কি নিশ্চয়তা আছে?
(গ) কা'ব আল আহবার ইয়াহূদী থেকে নামে মাত্র মুসলিম হয়েছিল এবং ইসরাঈলী রিওয়ায়েতকে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ বলে চালিয়ে দিত। ছাহাবায়ে কেরাম সেগুলো গ্রহণ করতেন। (না'ঊযুবিল্লাহ)
(ঘ) ইবনু শিহাব যুহরী উমাইয়া খলীফাদের নির্দেশে অনেক হাদীছ তৈরি করেছে। (না'ঊযুবিল্লাহ)।

নিম্নে তাদের উদ্ভট অভিযোগগুলোর জবাব প্রদান করা হল:
ধিক! শত ধিক!

দুনিয়াতে প্রতিটি দণ্ডায়মান বস্তুর একটি ভিত্তি আছে। পিলার আছে। একটি শত তলা বাড়ীকে ধ্বংস করার জন্য নীচতলার পিলারে আঘাত করাই যথেষ্ট। ইসলাম রক্ষার পিলার হচ্ছেন ছাহাবায়ে কেরাম। তাঁদের আমানতদারিতা ও চেষ্টার উপর ভিত্তি করে পবিত্র কুরআন ও হাদীছ আজ ১৪০০ বছর পরেও অক্ষত আছে। তাঁদের উপর যদি বিন্দুমাত্র অভিযোগ উত্থাপন তোলা হয়, তাহলে তার প্রভাব যেমন হাদীছের উপর পড়বে তেমনি কুরআনের উপরও পড়বে। অবুঝ হতভাগা মুসলিম হাদীছকে কুরআনের চেয়ে একটু নিম্ন স্তরের মনে করে হাদীছ নিয়ে ছাহাবায়ে কেরামের উপর উঠানো অভিযোগ নিয়ে চিন্তা

করা শুরু করে দেয়। তারা একটু কল্পনাও করে না এই একই অভিযোগ কুরআনের উপরও উঠতে পারে। কেননা কুরআনও ছাহাবায়ে কেরাম মুখস্থ করেছেন। ছাহাবায়ে কেরাম লিখেছেন। তারাই প্রচার করেছেন। তাই প্রথমেই প্রাচ্যবিদদের খড়কুটো খাওয়া পা-চাটা নামধারী মুসলিম লেখক ও পণ্ডিতদের জন্য ধিক! শত ধিক!

ছাহাবীগণের মর্যাদা :

পবিত্র কুরআন ও রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে সংরক্ষণ করার জন্য মহান আল্লাহ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের বাছাই করেছেন। যারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের সাহচর্য লাভের যোগ্যতা রাখেন, তাঁদেরকেই মহান আল্লাহ তাঁর ছাহাবা করেছেন। ইসলামকে রক্ষার জন্য যা যরূরী ছিল। তাইতো মহান আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র কুরআন মাজীদে ছাহাবীগণের প্রশংসা করেছন। তিনি বলেন,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ.

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকূ' ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইনজীলেও' *(আল ফাতাহ ২৯)*।

তিনি আরো বলেন,

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

'মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরস্থায়ী থাকবে। এটা মহা কামিয়াবী' *(আত-তওবা ১০০)*।

এ আয়াত দু'টিতে ছাহাবীগণের বৈশিষ্ট্য, তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

ছাহাবীগণ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জামা'আত। তাদের বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خَيرُ النَّاسِ قَرنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم.

আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মহানবী (ছাঃ) বলেছেন,'আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা। তারপর তার পরের যুগের লোকেরা, তারপর তার পরের যুগের লোকেরা'।[৫৮]

রাসূল (ছাঃ) সঠিক পথ পাওয়ার ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন ছাহাবীগণকে। তিনি বলেন, অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একদল জান্নতে যাবে বাকী সবাই জাহান্নামে। জিজ্ঞেস করা হল, তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল? তিনি জবাবে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي 'যারা আমার ও আমার ছাহাবীগণের আদর্শের উপর থাকবে'।[৫৯] তিনি আরো বলেন,

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.

'তোমরা আমার ছাহাবীদিগকে গালি দিওনা। সেই সত্ত্বার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! যদি তোমাদের কেউ উহুদ সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তবুও তাঁদের এক মুদ বা তার অর্ধেকের সমতুল্য হবে না'।[৬০]

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ.

'তোমরা রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণকে গালি দিও না! তোমাদের সারা জীবনের আমলের চেয়ে তাদের এক ঘণ্টা অনেক উত্তম'।[৬১]

মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণই এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ জামা'আত। তাঁদের অন্তর সবচেয়ে কল্যাণপূর্ণ। তাদের জ্ঞান সবচেয়ে বেশী গভীর। আর কেনইবা হবে না, তাঁরা এমন একটা জামা'আত, যাদেরকে মহান আল্লাহ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের সাহচর্যের জন্য ও তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য বাছাই করেছেন। তাঁরা তাঁদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে দুনিয়াতে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করেছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর কালেমার পতাকা হাতে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছেন কোথাও দা'ওয়াতের ময়দানে, কোথাও তাদরীসের ময়দানে আর কোথাও তলোয়ার হাতে যুদ্ধের ময়দানে নেতৃত্ব

৫৮. বুখারী হা/২৬৫২।
৫৯. সিলসিলা ছহীহা হা/১৩৪৮।
৬০. ইবনে মাজাহ হা/১৬১।
৬১. ইবনে মাজাহ হা/১৬২।

দিতে। যারা ছাহাবীগণের নিন্দা করবে, তাদের ঘৃণা করবে, তারা পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত। তদেরকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ঘৃণা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

ইসলাম পুরোটাই মু‘জিযা :

মহান আল্লাহ মহা জ্ঞানী। তিনি এমন পরিকল্পনা মাফিক ইসলামের উত্থান ঘটিয়েছেন, যেন ইসলামের কোন দিক অসম্পূর্ণ না থাকে। পুরো ইসলামকেই তিনি দুনিয়াবাসীর জন্য নিদর্শন করে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ জন্মের আগেই রাসূল (ছাঃ)-কে দিয়েছেন উন্নত বংশীয় মর্যাদা। ৪০ বছর ব্যপী তার সত্যতা ও আমানতদারিতার উপর আরববাসীর পূর্ণ বিশ্বস্ততা অর্জন করিয়েছেন। অশিক্ষিত অবস্থায় বড় করেছেন যাতে করে অতি উন্নতমানের সাহিত্যিক কুরআন অবতীর্ণ হলে কেউ যেন সন্দেহ না করতে পারে তিনি নিজে থেকে বানিয়ে বলছেন। নবুওয়াতের শুরুর দিকে বিপদে-আপদের সময় আর্থিক, মানসিক, পরিবারিক, সামাজিক সবধরনের সহযোগী হিসেবে দিয়েছেন খাদীজা (রাঃ)-কে। সময়ের পরতে পরতে পাশে পেয়েছেন চাচা আবু তালিব, হামযা ও আব্বাসকে। যখন যার দরকার হয়েছে, ঠিক তখন তিনি এসে হাযির হয়েছেন। শুরুর দিন থেকে পেয়েছেন একনিষ্ঠ বিশ্বাসী, অনুগত ও পরামর্শদাতা আবু বকর (রাঃ)-কে। যখন ইসলামের একজন ক্ষমতাধর ও সাহসী ব্যক্তির খুব প্রয়োজন, তখন পেয়েছেন ওমর (রাঃ)-কে।

তিনি আগে থেকেই যদি মুসলিম হতেন, তাহলে অতটা প্রভাব পড়ত না, যতটা কাফের থাকার পর ইসলামের কঠিন সময়ে মুসলিম হওয়ার মাধ্যমে হয়েছে। হিজরতের পর পাশে পেয়েছেন মদীনাবাসী ও আনছারকে। পেয়েছেন তাঁদের সীমাহীন ত্যাগ ও ভালবাসা। মদীনাতে প্রতিষ্ঠিত হতেই শুরু হল যুদ্ধ। প্রথম যুদ্ধে যদি পরাজয় হত তাহলে কি হত? আল্লাহু আকবার! যখন জয়ের দরকার, তখন আল্লাহ জয় দিয়েছেন। পরের যুদ্ধে পরাজয়ের শিক্ষা ও মুনাফিক্বদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। যখন ইসলামের বিজয়াভিযান দরকার, তখন আরবের সেরা যোদ্ধা খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও আমর ইবনুল ‘আছ ইসলাম গ্রহণ করলেন। যখন খন্দকের যুদ্ধ হল, তখন খন্দকের পরামর্শদাতা সালমান ফারেসীকে পেলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে যাবতীয় ভয়-ভীতি ও আশংকা থেকে মুক্ত হয়ে আরবসহ বহির্বিশ্বে জোরদার ইসলামের দা‘ওয়াতী কাজ করলেন। দুই বছরে আরবের চেহারা পাল্টে গেল। দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করল। ঠিক সঠিক সময়ে মক্কায় বিজয় অভিযান পরিচালনা করলেন। এভাবে মহান আল্লাহ ইসলামকে অংকুর থেকে ২৩ বছরে আরবের পরাশক্তিতে পরিণত করলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের আদর্শ

মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ বাছাই করলেন কুরাইশ বংশের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী মেয়ে মা আয়েশা (রাঃ)-কে। কুরআনের তাফসীর হেফাযত করার জন্য আল্লাহ তৈরি করলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে। রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে মুখস্থ করার জন্য আল্লাহ নিয়ে আসলেন আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে। ইসলামের হুকুম-আহকাম পরিবেশ পরিস্থিতির জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম থাকলেও শেষ সময়ে এসে সকল হুকুম-আহকাম পূর্ণতা ও স্থিরতা পায়। ঠিক তখনই আবু হুরায়রা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সারাদিন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে থেকে হাদীছ শ্রবণ করা ও রাতে মুখস্থ করার মাধ্যমে হাদীছ হেফাযত করেন।

অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ইসলাম সবদিক থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মে পরিণত হয়। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর যাদের দরকার ছিল, তারাই সামনে আসলেন। আবু বকর ও ওমর (রাঃ)। ইসলামের রাজনৈতিক ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য শুরু থেকেই তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর রাজনৈতিক কাজে সহযোগী ও পরামর্শদাতা হিসেবে পাশে থেকে যোগ্য উত্তরসূরীতে পরিণত হয়েছেন। তাঁরা রাজনৈতিকভাবে ইসলামকে দুনিয়ার পরাশক্তিতে পরিণত করেছেন। যদি আবু বকর (রাঃ) মুরতাদ ও যাকাত অস্বীকার কারীদের কঠোর হস্তে দমন না করতেন, তাহলে কি হত? আল্লাহু আকবার! রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর উত্তাল সাগরে দক্ষ মাঝির ন্যায় হাল ধরে থেকেছেন আবু বকর (রাঃ)। আড়াই বছরের অবিচলতায় ইসলামী রাষ্ট্রকে তিনি স্থির করেছেন। সেই স্থির পরিবেশে ১০ বছর জমি চাষ করেছেন ওমর (রাঃ)। অর্ধ পৃথিবীতে ইসলামের পতাকা তখন পতপত করে উড়ছে। যখন কুরআন সংরক্ষণ দরকার, তখন তারা কুরআন সংরক্ষণ করেছেন। যদি তারা কুরআনের আগে হাদীছ সংরক্ষণ করতেন তাহলে কি হত? আল্লাহু আকবার!

হাতে কুরআন ও বুকে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ নিয়ে ছাহাবীগণ দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লেন। দারস-তাদরীসে মগ্ন হয়ে গেলেন। সারা দুনিয়া থেকে এমন সব তাবেঈগণের উত্থান হল, যারা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ ছাহাবীগণের নিকট থেকে শুনে নিলেন। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, মুজাহিদ, ত্বাউস, যুহরী (রহঃ)। ঠিক যে সময় হাদীছ লিখিত আকারে সংরক্ষণের দরকার, তখন আল্লাহ নিয়ে আসলেন ক্ষণজন্মা মহা পুরুষ ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)- কে। শুরু হল হাদীছ লেখার স্মরণীয় ও স্বর্ণ যুগ। যখন দুনিয়াতে লেখালেখির কোন প্রচলন ছিল না, তখন হাদীছে রাসূল লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহর কি পরিকল্পনা! যখন মানুষের স্মৃতি শক্তি আস্তে আস্তে দুর্বল হওয়ার পথে, ঠিক তখনই একই সাথে আল্লাহ পাঠালেন ৬ মহান ব্যক্তিকে ইমাম আহমাদ, ইমাম

বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাঊদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম তিরমিযীকে। ৬ জন মহা পুরুষ মিলে সারা দুনিয়া চষে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ জমা করলেন, মুখস্থ করলেন, যাচাই-বাছাই করলেন, বইয়ে লিপিবদ্ধ করে চিরতরের জন্য হেফাযত করে দিলেন। *ফালিল্লাহিল হামদ।* যাদের অন্তরে ইসলামের এই মহান নিদর্শন নিয়ে হিংসার আগুন জ্বলছে, তারাই একমাত্র এগুলোর উপর উদ্ভট সব অভিযোগ উত্থাপন করে। ইসলাম রক্ষার এই সুপরিকল্পনা ও তার সফলতা তাদের গায়ের জ্বালা।

হাদীছের রক্ষক আবু হুরায়রা (রাঃ) :

হাদীছ নামটি আসার সাথে সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর পরেই আসে যার নাম, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ মুখস্থ করার জন্য যিনি রাতের ঘুম করেছিলেন হারাম, ক্ষুধার্ত অবস্থায় মসজিদে কাটিয়ে দিয়েছেন রাত-দিন, বিসর্জন দিয়েছেন আরাম, সত্যিকার হাদীছের ছাত্রের যিনি নমুনা ও আদর্শ, সারা দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশী যার নামের পরে 'রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু' পড়া হয়, রাসূল (ছাঃ)-এর নামের সাথে সবচেয়ে বেশী যার নাম উচ্চারণ করা হয়, তিনি আর কেউ নন ইলমে হাদীছের রক্ষক আবু হুরায়রা (রাঃ)।

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, হাদীছ শাস্ত্র দুইজন ব্যক্তির উপর দণ্ডায়মান। একজন আল্লাহর রাসূল, আরেকজন আবূ হুরায়রা। তাইতো হাদীছ বিদ্বেষীদের চক্ষুশুল তিনি। আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নামে কত রকমের জঘন্য অপবাদ তারা দিয়েছে, তা পড়তেও গা শিউরে উঠে। আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা বলতেন, তার কোন বংশ পরিচয় নেই, তিনি হাদীছের জন্য নয়, বরং খাবারের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর পিছে পিছে থাকতেন, তিনি ওমর (রাঃ)-এর যুগে অর্থ আত্মসাৎ করেছিলেন, তাই তাকে পদচ্যুত করা হয়েছিল ইত্যাদি কত যে মিথ্যা অভিযোগে তারা আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে অক্রমণ করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। নীচে তাদের উদ্ভট অভিযোগসমূহের দাঁতভাঙ্গা উত্তর প্রদান করা হল-

আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বংশ মর্যাদা ও তার ফীযলত :

আবু হুরায়রা (রাঃ) দাওস গোত্রের সরদার বংশের সন্তান ছিলেন। তার চাচা সা'দ ইবনে আবু যিবাব দাওস গোত্রের আমীর ছিলেন। রাসূল (ছাঃ), আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) সকলেই সাদ ইবনে আবু যিবাবকে দাওস গোত্রের আমীর পদে বহাল রাখেন।[৬২]

দাওস আরবের বিখ্যাত আযদ গোত্রের শাখা। মদীনার আওস ও খাযরাজগণও আযদ গোত্রের শাখা। হুদ (আঃ)-এর সন্তান কাহতানের বংশধর হচ্ছে আযদ।

৬২. দিফা 'আন আবি হুরায়রা, আব্দুল মুন'ঈম ছালেহ ১৮ পৃঃ।

অতএব, আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর পূর্ণ বংশ দাঁড়ায় আবু হুরায়রা আদ-দাওসী আল-আযদী আল-কাহতানী। খলীফা খাইয়াত্ব প্রদত্ত বংশনামা অনুযায়ী আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বংশনামা নূহ (আঃ) পর্যন্ত সুরক্ষিত। বর্তমান সঊদী আরবের যাহরান গোত্র দাওস গোত্রের শাখা। আজও যাহরানীরা আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে নিয়ে গর্ব করে। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীছ বিভাগের সিলেবাসের অর্ন্তভুক্ত বিখ্যাত বই 'তাদবীনুস-সুন্নাহ' ও 'ইলমুর রিজাল'-এর লেখক এই যাহরান বংশের সন্তান। আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর পূর্ণ বংশনামা নিম্নরুপ
أَبِي هُرَيْرَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ ذِي الشَّرَى بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ أَبِي صَعْبِ بْنُ مُنَبِّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ فَهْمِ بْنِ غَنْمِ بْنِ دَوْسِ الْغَوْثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ كَهْلَانَ بْنِ سَبَأَ بْنِ يَشْجُبَ بْنِ يَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ بْنِ هُودٍ.
আবু হুরায়রা ইবনে আমির ইবনে আবদি যিশ-শারা ইবনে ত্বারিফ ইবনে আত্তাব ইবনে আবি ছা'ব ইবনে মুনাব্বিহ ইবনে সা'দ ইবনে ছা'লাবা ইবনে সুলাইম ইবনে ফাহম ইবনে গানম ইবনে দাওছিল গাওছ ইবনে মালিক ইবনে যায় `ইবনে কাহলান ইবনে সাবা ইবনে ইয়াশজুব ইবনে ইয়ারুব ইবনে কাহতান ইবনে হুদ (আঃ)'।[৬৩]

ছাহাবী তুফায়েলের হাতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (ছাঃ) যখন খায়বারের যুদ্ধে, তখন নিজ মাতৃভূমি থেকে হিজরত করে চলে আসেন। হিজরতের সময় তিনি তরুণ। বয়স ত্রিশের কম হবে। কেননা তিনি ৫৯ হিজরীতে মারা গেছেন, তখন তাঁর বয়স ৭৮ আর খায়বারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৭ম হিজরীর সফর মাসে আর রাসূল (ছাঃ) মারা যান ১১ হিজরীর রবী'উল আওয়াল মাসে। অর্থাৎ তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছাহাবী হিসেবে থাকেন প্রায় সাড়ে ৪ বছর। তাঁর ফযীলত সীমাহীন, তিনি দাওস গোত্রের জন্য করা রাসূল (ছাঃ)-এর দু'আ, ইয়ামানীদের জন্য করা রাসূল (ছাঃ)-এর দু'আ, হিজরতের ফযীলত, রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে জিহাদ করার ফযীলত সবগুলোই তিনি পেয়েছেন। কেননা তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বেই হিজরত করেছেন। হিজরতের পর মক্কা বিজয়, হুনাইন, তাবুক ও মূতাসহ সকল যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে অগ্র সেনানীর ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে চাইতেন যেমনটা গাযওয়ায়ে হিন্দের হাদীছে ইচ্ছা পোষণ করেছেন। তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও ইবাদতগুযার ছিলেন। রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করা তাঁর অভ্যাস ছিল। তাঁর মেহমানদারিতার গল্প তাবেঈদের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি মদীনার মুফতীদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর

৬৩. তারীখ ত্বাবারী ১/৬১৩; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/৫৭৮।

পরে তাঁর ছাত্ররা মদীনার বিখ্যাত মুফতী হন। বিখ্যাত বদরী ছাহাবী উতবা (রাঃ)-এর বোন বুসরাকে তিনি বিবাহ করেন।[৬৪]

তিনি অত্যন্ত নিরহংকার ও মাটির মানুষ ছিলেন। যার নিদর্শন হচ্ছে মসজিদে নববীতে মিসকীন ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়ে দেওয়া। তিনি চাইলে ব্যবসা করতে পারতেন। তিনি যে ব্যবসায় সিদ্ধ হস্ত তা আমরা দেখতে পাব।

আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর জন্য রাসূল (ছাঃ) বিশেষভাবে দু'টি দুআ করেছেন,
(ক) তাঁর স্মৃতি শক্তি ও ইলমের জন্য।
(খ) মু'মিনগণ যেন তাঁকে ভালবাসেন। ঘটনা হচ্ছে, আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর মা কাফির ছিলেন। তিনি একদিন কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর রাসূলকে তার মায়ের হেদায়েতের জন্য দু'আ করতে বললেন। আল্লাহর রাসূল দু'আ করলেন। তাঁর মা ইসলাম কবুল করলেন। তিনি খুশীতে আল্লাহর রাসূলকে আরো একটি দু'আ করার জন্য আবেদন করেন। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন,
اللهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْهُمْ إِلَيْهِمَا.

হে আল্লাহ! তুমি তোমার এই ছোট বান্দাকে এবং তার মাকে তোমার মুমিন বান্দাদের প্রিয় করে দাও এবং তাদেরকে এদের নিকট প্রিয় করে দাও।[৬৫] আলহামদুলিল্লাহ আজ পর্যন্ত সকল মুমিন-মুসলিম আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে ভালবাসে একমাত্র অভিশপ্তরা ছাড়া। ওই অভিশপ্তদের জন্য আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর এই দু'আই যথেষ্ট।

কিভাবে তিনি এত হাদীছ বর্ণনা করলেন? :

হাদীছের ভাণ্ডারে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা প্রায় ৫০০০। যেখানে অন্য ছাহাবীগণের বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা তার অর্ধেক বা আরো কম। আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর অত্যাধিক হাদীছ বর্ণনার বাস্তব কিছু কারণ নিম্নে পেশ করা হল।

(ক) মুহাদ্দিছগণের নিকট একটি টেক্সটের আলাদা সনদকে আলাদা হাদীছ হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমনটা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। যিয়া আল আজমী (হাফিঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা নিয়ে তার মাস্টার্সের গবেষণা সর্ন্দভ তৈরি করেন। তার গবেষণায় ফুটে উঠেছে সনদ হিসেবে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীছের সংখ্যা ৫ হাযার বা ততোধিক হলেও মূল টেক্সট হিসেবে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীছ দেড়-দুই হাজারের বেশী নয়। তন্মধ্যে আবার কিছু জাল-যঈফ বর্ণনা আছে। এছাড়া তার বর্ণিত প্রায়

৬৪. বিস্তারিত-দিফা আন আবি হুরায়রা ৪০-৫০ ও ১৫৯।
৬৫. মুসনাদে আহমাদ হা/৮২৪২।

প্রতিটি রেওয়ায়েত অন্য ছাহাবীগণের নিকট থেকেও পাওয়া যায়। অন্যদিকে এমন রেওয়ায়েত যা তিনি একাই বর্ণনা করেছেন কিন্তু অন্য ছাহাবীগণের নিকট পাওয়া যায়না ৫০ এর বেশী নয়। তার এ গবেষণায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর উপর যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয় তা ডাহা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। বিস্তারিত দেখুন তার মাস্টার্স গবেষণাপত্র 'আবু হুরায়রা ফি যুয়ে মারবিয়্যাতিহি বি শাওয়াহিদিহা ওয়া হালি ইনফিরাদিহা' أبو هريرة في ضوء مروياته بشواهدها وحال انفرادها। উল্লেখ্য যে, শায়খ যিয়া হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম হয়ে হাদীছ নিয়ে পড়াশোনা করে বর্তমান পৃথিবীর একজন অন্যতম মুহাদ্দিছে পরিণত হয়েছেন। হাফিযাহুল্লাহ।

(খ) অন্য ছাহাবীগণের তুলনায় আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীছের সনদ বেশী হওয়ার পিছনেও কারণ রয়েছে। অন্যান্য ছাহাবীগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লেও আবু হুরায়রা (রাঃ) স্থায়ীভাবে মদীনায় দারস-তাদরীসের কাজে নিয়োজিত থাকেন। স্বাভাবিকভাবে ছাত্ররা তার কাছে পড়তে তো আসতই পাশাপাশি সারা দুনিয়া থেকে যারা হজ্জ-ওমরা করতে আসত তারাও মদীনা আসার সুবাদে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর দারসে বসত। বস্তুত অটোমেটিক তাঁর ছাত্র সংখ্যা অন্যদের তুলনায় বেশী হয়ে যায়। এই জন্য তাঁর হাদীছের সনদও বেশী হয়ে যায়। সনদ বেশী হওয়ায় মুহাদ্দিছগণের হিসেবে হাদীছের সংখ্যাও বেশী হয়ে যায়।

(গ) তিনি সব সময় রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে থাকতেন। অন্যরা ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও তিনি পরিবার-পরিজনহীন ব্যবসা-বাণিজ্যের ঝামেলা ছাড়াই অবিবাহিত এক যুবক। রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ শ্রবণ করাই তাঁর কাজ ছিল। যেমন তিনি নিজেই বলেন,

كان إخواني من الأنصار يشغلهم العمل في أرضهم وكان إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت إمرءاً مسكيناً من أهل الصفة وكنت ألزم رسول الله.

'আমার আনসার ভাইদেরকে জমি-জায়গার কাজ তাদের মাঠে ব্যস্ত রাখত আর আমার মুহাজির ভাইদেরকে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বাজারে ব্যস্ত রাখত। আর আমি আহলুস-সুফফার গরীব মানুষ ছিলাম এবং সবসময় আল্লাহর রাসূলকে ধরে থাকতাম'।[৬৬]

৬৬. ছহীহ বুখারী হা/২০৪৭।

(ঘ) রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের প্রতি তার সীমাহীন আগ্রহ ছিল। তিনি নিয়ম মাফিক হাদীছ মুখস্থ করতেন। যার জন্য তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে দু'আও চেয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং তার আগ্রহের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'আমি একদা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার শাফাআ'ত পাওয়া সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে হবে? রাসূল (ছাঃ) জবাবে বলেন, তোমার মধ্যে হাদীছের প্রতি যে আগ্রহ দেখেছি তা থেকে আমি ভেবেছিলাম এই হাদীছ সম্পর্কে তোমার চেয়ে যোগ্য কেউ জিজ্ঞেস করবে না'।[৬৭]

(ঙ) সর্বোপরি আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, রাসূল (ছাঃ) তার ইলমের জন্য দু'আ করেছেন। মুহাম্মাদ কায়েস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, 'একদা একজন ব্যক্তি বিখ্যাত ফক্বীহ ও অহী লেখক ছাহাবী যায়দ ইবনে ছাবেতকে জিজ্ঞেস করল। তিনি বলেন, তুমি আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞেস কর! কেননা একদিন আমি, আবু হুরায়রা ও আরেকজন মসজিদে নববীতে বসে আল্লাহর যিকর ও দু'আ করেছিলাম ইতিমধ্যেই রাসূল (ছাঃ) আমাদের মাঝে আসলেন। তিনি আমাদের দু'আ করতে বললেন, আমি এবং আমার সাথী দু'আ করলাম। রাসূল (ছাঃ) আমীন বললেন। তারপর আবু হুরায়রা দু'আ করলেন। তিনি বলল, আমার দুইজন সাথী যা চেয়েছে আমিও তা চাই এবং এমন ইলম চাই যা ভুলবনা। রাসূল (ছাঃ) আমীন বললেন। তখন আমরা বলে উঠলাম, আমরাও এমন ইলম চাই যা ভুলবনা। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, দাওসী গোলাম তোমাদের অগ্রগামী হয়ে গেছে'।[৬৮]

তাহক্বীক্ব : হাদীছের সনদকে হাফেয ইবনু হাযার আসক্বালানী উত্তম বলেছেন।[৬৯]

উল্লেখ্য যে তার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর দু'আর এ ঘটনাটি যায়দ ইবনে ছাবিত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন এই জন্য উল্লেখ করলাম অন্যথায় স্বয়ং আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে তার মুখস্থ শক্তির জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর দু'আর একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে।[৭০]

৬৭. ছহীহ বুখারী হা/২০৪৭।
৬৮. নাসায়ী হা/৫৮৪৯।
৬৯. ইসাবা ৭/৩৫৭ পৃঃ।
৭০. ছহীহ বুখারী হা/১১৯।

তিনি কি খাদ্যলোভী ছিলেন? :

আরবী ভাষা সর্ম্পকে অজ্ঞতার দরুণ বা বিকৃতির উদ্দেশ্যে প্রাচ্যবিদরা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর ফযিলতের হাদীছকে তার উপর অভিযোগ বানিয়ে দিয়েছে।
أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ إِنِّى كُنْتُ امْرَءاً مِسْكِيناً أَلْزَمُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى مِلْءِ بَطْنِى وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ.
আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'তোমরা মনে কর আমি প্রচুর হাদীছ বর্ণনা করি। আল্লাহর কসম আমি মিসকীন মানুষ ছিলাম। সবসময় রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে থাকতাম। কোন মতে পেট চলাটা আমার জন্য যথেষ্ট ছিল। আর মুহাজিরগণকে বাজার ব্যস্ত করে রেখেছিল। আর আনসারগণকে তাদের ধন-সম্পদ ব্যস্ত করে রেখেছিল'।[৭১]

প্রাচ্যবিদগণ এই হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, তিনি খাদ্যের লোভী ছিলেন। তাদের জবাবে বলতে চাই, মনে করলেন! কোন স্ত্রী তার স্বামীকে বলছে, আমি যত কষ্টই হোক তোমার সাথেই থাকতে চাই। আমার অত কিছুর দরকার নেই। কোনমতে একটু খেতে পেলেই হল। আপনি কি এই কথার জন্য স্ত্রীকে খাবারের লোভী বলবেন? না তাকে আপনার সাথে থাকার আগ্রহী বলবেন? ঠিক অনুরুপ আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বিষয়টি।

আরবী ভাষার একটি বর্ণ 'লাম' যা সাধারণত উদ্দেশ্য ও কারণ বুঝানোর জন্য আসে। আবু হুরায়রা (রাঃ) এ হাদীছে বলেননি যে, 'লি মিলই বাতনি' তথা পেট ভরার জন্য। তিনি কারণ বুঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'লাম' বর্ণটি ব্যবহার করেননি বরং 'আলা' বর্ণটি ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন 'আলা মিলই বাতনি' । যার অর্থ হচ্ছে আমার পেটের চিন্তা নেই কোনমতে একটু খেতে পেলেই হল। এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি আর কিছু চাইনা। আমার ধন-দৌলতের দরকার নেই। আমার ভাল-খাবারের দরকার নেই। কোনমতে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে থাকতে পারাটাই আমার চাওয়া ও পাওয়া।

এই জন্যই তিনি উঁচু পরিবারের সন্তান হওয়ার পরেও, ব্যবসা বাণিজ্যে বিরাট পারদর্শিতা থাকার পরেও সারাদিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় মসজিদে থাকতেন শুধু রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সংগ্রহ করার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর সান্নিধ্যে থাকার মহান আশায়। মহান আল্লাহ তার এই চেষ্টাকে কবুল করেছেন। আজ তিনিই রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের মুখপাত্র বলা যায়। ফালিল্লাহিল হামদ।

তিনি কি অর্থ আত্মসাৎ করেছিলেন? :

৭১. মুসনাদে আহমাদ হা/৭২৭৩।

না'ঊযুবিল্লাহ! প্রাচ্যবিদরা সকল সীমানা অতিক্রম করে আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে অর্থ আত্মসাৎের অভিযোগে অভিযুক্ত করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। আল্লাহর অভিশাপ তাদের উপর বর্ষিত হোক! আমীন!!

(ক) আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত করা মানে রাসূল (ছাঃ)-কে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত করা। কেননা সাধারণ ছাহাবী ও সর্বদা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে থাকা ঘনিষ্ঠ ছাহাবীগণের মধ্যে পার্থক্য আছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط.

'মানুষ তার বন্ধুর স্বভাবের উপর। অতএব (তোমরা কারো সম্পর্কে জানতে চাইলে) সে কার সাথে মিশে তাকে দেখ'।[৭২]

এই একটি হাদীছই ছাহাবায়ে কেরাম বিশেষ করে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর মত রাসূল (ছাঃ)-এর ঘণিষ্ঠ ছাহাবীগণের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য যথেষ্ট। এই হাদীছের আলোকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, যারা ঘনিষ্ঠ ছাহাবীগণের বিরুদ্ধে এই জাতীয় অভিযোগ উত্থাপন করে তারা মূলতঃ রাসূল (ছাঃ)-কে একজন অযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে। তিনি এমন এক ব্যক্তিকে সবসময় তার সাথে রাখতেন যে অর্থের লোভী। এটা রাসূল (ছাঃ)-এর মর্যাদা বিরোধী। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণকে দিয়ে তার রাসূলকে অপমান করাতে পারেন না। সুতরাং আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর মত ঘনিষ্ঠ ছাহাবী অর্থ আত্মসাৎকারী হতে পারেন না। অসম্ভব!

(খ) আমরা পূর্বেই বলেছি তিনি উঁচু বংশের সন্তান ছিলেন। শুধু দ্বীন ও রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের খাতিরে তিনি সীমাহীন কষ্ট সহ্য করেছেন। তাঁর মত সরদার বংশের সন্তানের সাথে এই স্বভাব যায়না। যেখানে তারা যুগ যুগ থেকে দাওস গোত্রের নেতা। তাঁর চাচা খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও আমীর ছিলেন।

(গ) কথায় আছে অভাবে স্বভাব নষ্ট। যখন তিনি ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেধে রাখতেন। অজ্ঞান হয়ে মসজিদে পড়ে থাকতেন, তিনি চাইলে তখনি আত্মসাৎ করতে পারতেন। খায়বার, তাবুক, মুতা ইত্যাদী যুদ্ধের গণীমত তার সামনে বন্টিত হয়েছে। যখন দরকার তখন তিনি আত্মসাৎ করলেন না ক্ষুধার জ্বালায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকলেন। আর যখন তিনি আমীর, শত ছাত্রের উস্তায, তাবেঈগণের চোখের মণি তখন অর্থ আত্মসাৎ করে নিজের ইযযত ধ্বংস করবেন? কি সেলুকাস! কি বিচিত্র!

৭২. মুসনাদে আহমাদ হা/৮০১৫।

(ঘ) তিনি দুনিয়াবিমুখ ছাহাবী ছিলেন। একদা গণীমতের মাল বণ্টন হচ্ছিল। সকল ছাহাবী তাদের নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করছিলেন। কিন্তু আবু হুরায়রা (রাঃ) গ্রহণ করছিলেন না। হাদীছে এসেছে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا تَسْأَلُنِي مِنْ هَذِهِ الْغَنَائِمِ الَّتِي يَسْأَلُنِي أَصْحَابُكَ؟» فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ.

রাসূল (ছাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমার নিকট গণীমত চাইবেনা যেমন তোমার সঙ্গী-সাথীরা চাচ্ছে? তখন আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি আপনার নিকট চাইব, আপনি আমাকে তা শিখিয়ে দিন যা আপনাকে মহান আল্লাহ শিখিয়েছেন।[৭৩]

তাহক্বীক্ব : সনদ হাসান পর্যায়ের।

ঘটনার বাস্তবতা :

প্রাচ্যবিদরা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নামে অর্থ আত্মসাতের যে ঘটনা প্রচার করে থাকে তা বিকৃত ও আংশিক। প্রাচ্যবিদরা ঘটনাটি পূর্ণ প্রচার করেনা। নীচে বিস্তারিত বর্ণনা করা হল। ভূমিকা স্বরুপ প্রথমে বলে নেয়া যরুরী। ওমর (রাঃ)-এর কঠোরতা সকলের জানা। প্রায় হাদীছে আমরা দেখি একটু এদিক সেদিক হলেই ওমর (রাঃ) বলে উঠেন আল্লাহর রাসূল অনুমতি দিন! আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তাঁকে দেখে মানুষ তো ভয় করে করে শয়তানও ভয় করে। মদীনার মহিলা থেকে শুরু করে বাচ্চারাও ভয় পেত।[৭৪]

তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) ও আবু বকর (রাঃ)-এর পর তিনি ছাহাবীগণের অভিভাবকে পরিণত হন। অভিভাবক হিসেবে যেমন তিনি তাদেরকে স্নেহ করতেন তেমনি দায়িত্বশীল ছাহাবীগণের নিকট থেকে কড়াভাবে কাজের হিসাব নিতেন। একটু ত্রুটি দেখলেই ধমক দিতেন। অনেক সময় ক্ষমতাচ্যুত করতেন। সব সময় তার সিদ্ধান্ত ঠিক হত এমন নয় অনেক সময় ভুল হত। ভুল হলে তিনি সাথে সাথে শুধরে নিতেন। ছালামের বিষয়ে প্রসিদ্ধ ঘটনায় হাদীছের হিফাযতের জন্য তিনি আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-এর সাথে অনেক কড়াকড়ি করেন।[৭৫]

তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-কে যুদ্ধের ময়দানে ক্ষমতাচ্যুত করেন।[৭৬] তাঁর প্রতিটি নির্দেশের পিছনে কোন না কোন রহস্য থাকত। যা তিনি সব সময়

৭৩. হুলিয়াতুল আওলিয়া ১/৩৮১।
৭৪. ছহীহ বুখারী হা/ ৩২৯৪; তিরমিযী হা/৩৬৯১।
৭৫. ছহীহ মুসলিম হা/২১৫৩।
৭৬. বিদায়া ও নিহায়া ৭/৭৬।

প্রকাশ করতেন না। যত কিছুই হোক তিনি আইন ভঙ্গ করতেন না। কে কত বড় তা তিনি দেখতেন না। সবার কাছে হিসাব নিতেন। পাই পাই হিসাব নিতেন। নিজেই তাদের কাজের অনুসন্ধান করতেন। তার এই কঠোরতা ও আইনের শাসনের কারণেই মূলতঃ তার শাসনামলে কোন ফিতনা সৃষ্টি হওয়া তো দূরের কথা মাথা চাড়া দেওয়ার সুযোগই পাইনি।

আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ) আ'লা আল হাযরামীর সাথে দ্বীন শিখানোর জন্য বাহরাইনে পাঠিয়েছিলেন। আবু বকর (রাঃ) ও তাকে বাহরাইনে পাঠিয়েছিলেন।[৭৭]

আবু বকর (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর ওমর (রাঃ) ছাহাবীগণের পরামর্শ সভা ডাকেন। এ সভায় আবু হুরায়রা (রাঃ)ও উপস্থিত ছিলেন। ওমর (রাঃ) সবাইকে লক্ষ্য করে রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনার জন্য সহযোগিতা চান। ছাহাবীগণ তাঁকে সহযোগিতার বিষয়ে আশ্বস্ত করেন। আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর পূর্ব অভিজ্ঞতার দরূন ওমর (রাঃ) এ বৈঠকেই তাকে বাহরাইনের গর্ভনর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৭৮]

এ ঘটনা প্রমাণ করে আবু হুরায়রা জ্ঞানীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন এই জন্যই পরামর্শসভায় তাঁকে ডাকা হয়েছে।

দায়িত্ব গ্রহণের এক বছরের মাথায় আবু হুরায়রা (রাঃ) বাৎসরিক হিসাব নিয়ে মদীনায় আসলেন। সাথে ছিল কেন্দ্রে প্রদানের জন্য ছিল ৪ লাখ দিনার। মাত্র এক বছরে ৪ লাখ দিনার! ওমর (রাঃ) টাকার আধিক্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। তিনি প্রশ্ন করেন, তুমি কারো প্রতি যুলুম করনি তো? জবাবে তিনি বলেন, না। কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করনি তো? জবাবে তিনি বলেন, না। তোমার নিজস্ব কি আছে? তিনি জবাবে বললেন, ২০ হাযার রিয়াল। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় পেয়েছ? তিনি বললেন ব্যবসা করেছি। অন্য রেওয়ায়েতে তিনি ব্যবসা সম্পর্কে বিস্তারিত বলেন। ওমর (রাঃ) বললেন, তোমার মূলধন গ্রহণ কর! আর লভ্যাংশ বায়তুল মালে দিয়ে দাও![৭৯]

এ ঘটনা থেকে গ্রহণ করা প্রাচ্যবিদদের বিকৃত উদ্দেশ্যের জবাবে বলতে চাই,
(ক) ওমর (রাঃ) প্রখর ধী শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে এবং আবু বকর (রাঃ)-এর সাথে রাষ্ট্রীয়কাজে শরীক ছিলেন। যদি তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর মধ্যে কোন ত্রুটি বুঝতে পারতেন তাহলে তাকে

৭৭. আনওয়ারুল কাশিফা, মুয়াল্লিমী ২২৫ পৃঃ।
৭৮. কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসুফ ১১৪ পৃঃ।
৭৯. আমওয়াল, আবু ওবায়দ ২৬৯ পৃঃ; আনওয়ারুল কাশিফা মুয়াল্লিমী ২১৩পৃঃ।

বাহরাইন পাঠাতেন না। রাসূল (ছাঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে শুধু দ্বীন প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাকে গভর্নর কাছেও পাঠান। আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর যোগ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য তার এই মনোনয়নই যথেষ্ট।

(খ) আবু হুরায়রা (রাঃ) যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাষ্ট্র পরিচালনা সহ দুনিয়াবী কাজেও পারদর্শী ছিলেন, এ ঘটনা তার অন্যতম প্রমাণ । মাত্র এক বছরে রাষ্ট্র পরিচালনার খরচের পর কেন্দ্রের জন্য ৪ লাখ দিনার লভ্যাংশ অর্জন করা তার যোগ্যতার পরিচয় বহন করে। সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ক্ষুর্ধাত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে থাকার পিছনে মূলতঃ দরিদ্রতা কারণ নয় বরং হাদীছের প্রতি তার সীমাহীন আগ্রহই অন্যতম কারণ।

(গ) এ ঘটনায় কোথাও তাঁকে পদচ্যুত করার কথা নেই। এই মর্মে ছহীহ সূত্রে যত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সব জায়গায় শুধুমাত্র হিসাব গ্রহণের কথা এসেছে। এটাকেই প্রাচ্যবিদরা বিকৃত করে পদচ্যুত করার ঘটনায় রুপ দিয়েছেন।

(ঘ) ওমর (রাঃ) একই কাজ মুয়ায ইবনে জাবালের সাথে আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফত আমলে এবং তার খিলাফত আমলে আবু মূসা আল-আশআ'রী, সা'দ ও হারিছ (রাঃ)-এর সাথে করেছেন। তাঁদের নিকট থেকেও তাঁদের ব্যবসার লভ্যাংশ বায়তুল-মালে জমা করিয়েছেন।[৮০]

মৌলিক ভাবে এর পিছনে কারণ ছিল ইসলামী খিলাফতের স্বচ্ছতা বজায় রাখা। যেহেতু তখন বিভিন্ন জাতি-প্রজাতির মানুষ নিয়ে অর্ধ-বিশ্বে কালেমার পতাকা পত পত করে উড়ছে। সব জায়গায় ছাহাবায়ে কেরাম নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। যদি তাদের ধন-সম্পদ বেড়ে যায় চাহে যতই হালাল পন্থায় বাড়ুক সেই দেশের মানুষরা অভিযোগ করবে আমাদের টাকা মেরে খেয়ে আরবেরা বড়লোক হয়ে গেল। আর এটাই স্বাভাবিক। ওমর (রাঃ) অত্যন্ত চৌকস রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি দুনিয়ার মানুষের সাইকোলোজী বুঝতেন। তাই তিনি ইসলামী খিলাফতের স্বচ্ছতা দুনিয়ার সামনে বজায় রাখার জন্য এবং ছাহাবায়ে কেরামকে মানুষের সমালোচনার পাত্র হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য সকল গর্ভনরের অতিরিক্ত ইনকাম বাধ্যতামূলক বায়তুল-মালে দান করাতেন। তিনি নিজেও করতেন।

(ঙ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে তিনি যে অর্থ আত্মসাৎের অভিযোগে অভিযুক্ত করেননি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে পুনরায় বাহরাইন যাওয়ার জন্য বলেন। কিন্তু আবু হুরায়রা (রাঃ) মদীনায় থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৮১]

৮০. তাবাক্বাত, ইবনু সাদ ৩/১০৫; আনওয়ারুল কাশিফা, মুয়াল্লিমী ২১৩।
৮১. আমওয়াল, আবু ওবায়দ ২৬৯।

উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয়বার বাহরাইন প্রেরণের কথাকে প্রাচ্যবিদরা লুকানোর চেষ্টা করে অথবা না জেনেই যঈফ বলার ঘৃণিত অপচেষ্টা চালায়। অথচ সনদ নিঃসন্দেহে ছহীহ।[৮২]

মূলতঃ আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর মদীনা থাকার মধ্যেই কল্যাণ ছিল। কেননা মদীনা ইলমী মারকায ছিল। স্থায়ীভাবে মদীনাতে থাকার ফলেই তাঁর ছাত্র সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পায় এবং তিনি পূর্ণরুপে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের খিদমাতে মনোনিবেশ করতে পারেন। ফালিল্লাহিল হামদ।

আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বিষয়ে ছাহাবায়ে কেরামের মন্তব্য

তালহা (রাঃ)-এর মন্তব্য :

قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا نَشُكُّ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ نَسْمَعْ وَعَلِمَ مَا لَمْ نَعْلَمْ إِنَّا كُنَّا أَقْوَامًا أَغْنِيَاءَ وَلَنَا بُيُوتَاتٌ وَأَهْلُونَ وَكُنَّا نَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرَفَيِ النَّهَارِ وَكَانَ مِسْكِينًا لَا مَالَ لَهُ وَلَا أَهْلَ إِنَّمَا كَانَتْ يَدُهُ مَعَ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ مَا دَارَ.

জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জন ছাহাবীর অন্যতম ত্বলহা (রাঃ) বলেন, ‘আল্লাহর কসম আমরা কোন সন্দেহ করি না, অবশ্যই সে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে তা শুনেছে যা আমরা শুনিনি এবং তা শিখেছে যা আমরা শিখিনি। আমরা ধনী মানুষ ছিলাম। আমাদের বাড়ী-ঘর ও পরিবার-পরিজন ছিল। আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট দিনের কোন একভাগে আসতাম। আর সে মিসকীন ছিল। তার কোন ধন-সম্পদ ছিল না। ছিলনা কোন পরিবার-পরিজন। তার হাত থাকত রাসূল (ছাঃ)-এর হাতের সাথে। রাসূল (ছাঃ) যেখানে যেত সে সেখানে যেত’।[৮৩]

তাহক্বীক্ব : হাদীছের সকল রাবী মযবূত মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ব্যতীত। তিনি মুদাল্লিস। তিনি মুসনাদে বাযযারে শ্রবণের বিষয়ে স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার না করলেও মুসনাদে ইয়ালাতে শ্রবণের বিষয়ে স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করেছে।[৮৪] সুতরাং হাদীছটি নিঃসন্দেহে হাসান।

ইবনু ওমর (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ)-এর সত্যায়ন :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ

৮২. আনওয়ারুল কাশিফা ২১৫; বিদায়া ও নিহায়া ৮/১১৯; হিলয়াতুল আওলিয়া ১/৩৮০; ইসাবা, আসক্বালানী ৮/৩৩।
৮৩. মুসনাদে বাযযার হা/৯৩২।
৮৪. মুসনাদে ইয়ালা হা/৬৩৬।

أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْشُدُكِ بِاللَّهِ أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ نَعَمْ فقال له ابن عصر أنت يا أبا هريرة كنتَ ألزَمَنَا لرسول اللهَ صلى الله عليه وسلم وأعلَمَنَا بحديثه.

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি একদা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ শুনাচ্ছিলেন, যে ব্যক্তি জানাযার ছালাতে উপস্থিত হবে তার জন্য এক কি্বরাত নেকী আর যে ব্যক্তি দাফনেও অংশগ্রহণ করবে তার জন্য দুই কি্বরাত নেকী। আর এক কি্বরাতের পরিমাণ উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বড়। এ হাদীছ শুনে ইবনু ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, হে আবু হুরায়রা! তুমি কি হাদীছ বর্ণনা করছ খিয়াল কর! তখন আবু হুরায়রা (রাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ইবনু ওমর (রাঃ)-এর হাত ধরে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ)-এর নিকটে নিয়ে গিয়ে বললেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি কি রাসূল (ছাঃ) থেকে এই হাদীছ শুনেননি? তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, জী হ্যাঁ। অতঃপর ইবুন ওমর (রাঃ) বলেন, আবু হুরায়রা! তুমি সত্যিই আমাদের চেয়ে বেশী রাসুলের সাথে থাকতে এবং আমাদের চেয়ে তার হাদীছ সম্পর্কে বেশী জ্ঞান রাখ।[৮৫]

তাহক্বীক্ব : সনদের সকল রাবী মযবূত।
শুধু তাই নয় অন্য রেওয়ায়েতে ইবনু ওমর (রাঃ) আফসোস করে বলেন,

قَالَ لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً.

আমরা জীবনে অনেক কিরাত্ব নষ্ট করেছি।[৮৬]

হুযায়ফা (রাঃ)-এর মন্তব্য :

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تَكُونَ فِي شَكٍّ مِمَّا يَجِيءُ.

হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'একজন ব্যক্তি ইবনু ওমর (রাঃ)-কে বলল, নিশ্চয়! আবু হুরায়রা রাসূল (ছাঃ) থেকে অনেক হাদীছ বর্ণনা করে।

৮৫. মুসনাদে আহমাদ হা/৪৪৫৩।
৮৬. ছহীহ মুসলিম হা/৫২।

তখন ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, তার বর্ণিত কোন হাদীছ নিয়ে তোমার সন্দেহ করা থেকে আমি আল্লাহর নিকট তোমার পরিত্রাণ চাই'।[৮৭]

ছাহাবীগণের ইজমা :

জানাযার ছালাতে সাধারণত গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গকে পাঠানো হয়। আর জানাযার ছালাত যদি হয় মা আয়েশা (রাঃ)-এর তাহলে স্বভাবতঃই ছাহাবীগণের মাঝে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তিনিই আদায় করাবেন। ৫৭ হিজরীর রমযান মাসে যখন মুমিনগণের মা আয়েশা (রাঃ) মারা যান তখন ছাহাবায়ে কেরাম আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে জানাযার ছালাত পড়ানোর জন্য নির্বাচন করেন।[৮৮]

৫৭ হিজরীর এই ঘটনা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর ন্যায়পরায়ণতা ও সততার ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম ও মদীনাবাসীর ইজমা বলা যায়। আর এই ঘটনা উপরে উল্লেখিত সকল অভিযোগের অনেক পরের ঘটনা। যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে উপরের সকল অভিযোগ ডাহা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে শত্রুতার নির্মম পরিণতি

কাজী ত্ববারী বর্ণনা করেন আমরা একদা জা'মে মানসুরে হাদীছের দারসে ছিলাম। খোরাসান থেকে একজন হানাফী মাযহাবের অনুসারী যুবক আসল। সে মুসাররাতের হাদীছ সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করল। তখন তাকে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীছ শুনানো হল। (মুসাররাতের হাদীছ বিষয়ক আলোচনা যথা জায়গায় করা হবে ইনশাআল্লাহ) সে বলল,

أَبُو هُرَيْرَةَ غَيْرُ مَقْبُولِ الْحَدِيثِ.

আবু হুরায়রার হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। (না'ঊযুবিল্লাহ!) রাবী বলেন, তার এই কথা বলা শেষ হয়নি সাথে সাথে ছাদ থেকে বিরাট একটা সাপ তার সামনে পড়ল। ছেলেটি ভয়ে পালাতে লাগল। সাপটিও তার পিছু নিল। মানুষজন তাকে বলল তওবা কর! তওবা কর! সে তওবা করল। সাথে সাথে সাপটি হারিয়ে গেল। ঘটনাটি অনেক আয়েম্মায়ে কেরাম সনদসহ উল্লেখ করেছেন। সনদ উঁচু পর্যায়ের ছহীহ।[৮৯]

নিকট অতীতে মিসরের অভিশপ্ত লেখক আবু রাইয়া। আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বিষয়ে এমন কি নেই যা সে বলেনি। আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াহিয়া আল

৮৭. মুস্তাদরাকে হাকিম হা/৬১৬৫।
৮৮. বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৮/১০১।
৮৯. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম ৩/৩৫৪; তারীখুল মুলুক ওয়াল উমাম ১৭/১০৬; যাহাবী, সিয়ার আলামিন নুবালা ২/৬১৯।

মুয়াল্লীমী (রহঃ) তার আনওয়ার আল কাশিফা বইয়ে তার সকল অভিযোগের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। এই অভিশপ্ত ব্যক্তিটি মৃত্যুর পূর্বে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নাম চিৎকার করতে করতে উচ্চারণ করছিল। মহান আল্লাহ আমাদেরকে এই সমস্ত অভিশপ্তদের হাত থেকে রক্ষা করুন!

কা'ব আল আহবার

প্রাচ্যবিদরা বিদ্বেষ বশত অক্রমণ করার জন্য নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে এই জাতীয় দাবী উত্থাপন করেছে। তাদের দাবী অনুযায়ী কা'ব আল-আহবার (রহঃ) নামে মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাওরাত-ইঞ্জীলের বড় পন্ডিত ছিলেন। তিনি ছাহাবীগণের সামনে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত করতেন। ছাহাবায়ে কেরাম সেগুলো বর্ণনা করতেন। এই অভিযোগের জবাব নিম্নে প্রদত্ত হল।

(ক) মনে করেন আপনি ও আপনার কয়েকজন গ্রাম্য বন্ধু। এক সাথে বেড়ে উঠা। এক সাথে পড়াশোনা। একই প্লেটে খাওয়া। সময়ের পরিক্রমায় আপনারা সবাই মিলে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। আপনাদের সবচেয়ে যোগ্য বন্ধুটি স্কুলের প্রধান। বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে প্রতিষ্ঠানকে আপনারা অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। দুই দশক থেকে আপনারা মিলে মিশে প্রতিষ্ঠানটি চালিয়ে আসছেন। হঠাৎ আপনাদের বন্ধু একদিন মারা গেল। আপনারা স্কুলের ইতিহাস ও তার জীবনী লিখবেন বলে ভাবছেন। ইতিমধ্যেই একজন নতুন ছাত্র আপনাদের স্কুলে এসে ভর্তি হয়েছে। সে আপনাদের কাছে স্কুল এবং আপনাদের বন্ধু সর্ম্পকে গল্প করা শুরু করল। এমন সব নতুন তথ্য দেয়া শুরু করল যা আপনারা ঘুণাক্ষরেও জানতেন না। কোনদিন শুনেননি। আপনারা তার দেয়া তথ্যগুলোকে লুফে নিলেন এবং স্যারের জীবনী ও স্কুলের ইতিহাস বলে চালিয়ে দিলেন। এ ঘটনা কি বিশ্বাসযোগ্য? সত্যি বলতে কি এই ঘটনা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি প্রাচ্যবিদদের এ দাবীও অবিশ্বাস্য।

(খ) ছাহাবায়ে কেরাম সকাল-সন্ধ্যা ইসলাম পালন করতেন। ইসলামের হুকুম-আহকাম তাঁদের ব্যক্তি জীবনে, পরিবারে, সমাজে রাষ্ট্রে পূর্ণভাবে পালিত। তাদের সামনে উড়ে এসে জুড়ে বসে কেউ হুকুম-আহকাম শিখাবে এটা আকাশ কুসুম কল্পনা বৈ কিছুই নয়। যদি তারা কা'ব আল-আহবার থেকে কিছু গ্রহণ করে থাকেন তাহলে তা ইতিহাস বিষয়ক ও ক্বিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত ফিৎনা বিষয়ক।

(গ) কা'ব আল-আহবার মুনাফিক ছিলেন না। বায়তুল মাক্বদিস বিজয়ের সময় ওমর (রাঃ) তাঁকে পাশে রেখেছিলেন। তার দিক নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি

বায়তুল মাক্বদিস সংস্কার করেন।[৯০] তাঁর মধ্যে যদি কোনরুপ ত্রুটি থাকত তাহলে ওমর (রাঃ)-এর মত দূরদৃষ্টি ও তুখার ধী শক্তির অধিকারী মানুষ তাকে পাশে রাখা দূরের কথা। শাস্তি প্রদান করতেন। ছাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে আইম্মায়ে এযাম কেউ তার উপর জারাহ করেন নি। তাকে দুর্বল বা ত্রুটিযুক্ত বলেননি।

(ঘ) হাদীছের ভাণ্ডারে কা'ব আল-আহবারের হাদীছ নেই বললেই চলে। অত্যন্ত অল্প সংখ্যক। যা একেকটু পাওয়া যায় তা ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে ও তাফসীরের গ্রন্থগুলোতে। সুতরাং প্রাচ্যবিদদের অভিযোগ বাস্তবতার দৃষ্টিতে অচল।

মুনাফিক্ব ছাহাবী

হাদীছের ভাণ্ডারে সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য প্রাচ্যবিদদের স্পর্ধা সত্যিই অনস্বীকার্য। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে অনেক মুনাফিক ছাহাবী ছিলেন। একথা সত্য এবং বাস্তব। প্রাচ্যবিদরা এই সুযোগটাকে লুফে নিয়েছে। তারা দাবী করে বসল, মুনাফিক্ব ছাহাবীগণ যে রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা হাদীছ বলে চালিয়ে দেননি তার কি গ্যারান্টি আছে? তাদের এই অভিযোগের জবাব নিম্নে প্রদত্ত হল-

(ক) ছাহাবীগণের মাঝে মুনাফিক্বরা স্পষ্ট ছিল যেমন, কাব ইবনে মালিক (রাঃ) তাবুকের যুদ্ধ থেকে পিছনে থেকে গেছিলেন। তার সেই বিখ্যাত হাদীছে তিনি বলেন, রাসূলের কাফেলা চলে যাওয়ার পর আমি বের হয়ে দেখলাম, মদীনাতে মুনাফিক্ব ছাড়া এবং ওযরের কারণে যারা থেকে গেছে তারা ছাড়া আর কেউ নেই।[৯১] তার এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় ছাহাবায়ে কেরাম মুনাফিক্বদের চিনতেন। মুনাফিক্বরা যদি রাসূল (ছাঃ)-এর নামে হাদীছ বর্ণনা করত তাহলে অবশ্যই তারা তা ধরে ফেলতেন।

(খ) হুযায়ফা (রাঃ)-এর কাছে মদীনার মুনাফিক্বদের লিস্ট ছিল। এই জন্য তাকে বলা হয় সিররু রাসূলিল্লাহ। রাসূল (ছাঃ)-এর গোপন বিষয়ের সংরক্ষক।[৯২] তিনি যদি বুঝতে পারতেন কোন মুনাফিক্ব হাদীছ রেওয়ায়েত করছে অবশ্যই তিনি তা প্রকাশ করে দিতেন। হয়তো এই উদ্দেশ্যেই রাসূল (ছাঃ) তাকে মুনাফিক্বদের লিস্ট দিয়ে গেছিলেন।

(গ) রাসূল (ছাঃ) মারা যাওয়ার পর সকল মুনাফিক্বের চেহারা উন্মোচন হয়ে যায়। কেউ মুরতাদ হয়ে পূর্বের দ্বীনে ফিরে যায়। কেউ মিথ্যুক নবীর

৯০. আল বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৯/৬৬১।
৯১. মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৭৮৯।
৯২. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৩৩১।

দাবীদারদের উপর ঈমান আনে। কেউ যাকাত অস্বীকার করে বসে। হাদীছ শাস্ত্রে এদেরকে ছাহাবীই মনে করা হয়না। কিভাবে তাদের হাদীছ নেয়া হবে?

(ঘ) প্রাচ্যবিদরা কিয়ামত পর্যন্ত একটা প্রমাণ দিতে পারবেনা যে, মুনাফিক্বরা রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা বর্ণনা করেছে আর ছাহাবীগণ তা গ্রহণ করেছে এবং বর্ণনা করেছে। উদ্ভট দাবী করা যত সহজ প্রমাণ করা তত সহজ নয়।

ইবনু শিহাব যুহরী ও উমাইয়া খলিফাগণ

মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (রহঃ) উম্মতে মুসলিমার উপর মহান আল্লাহর এক অশেষ রহমত। তিনি তার তুখোড় স্মৃতি শক্তি এবং ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর নির্দেশে লিখনীর মাধ্যমে হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর হেফাযতে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। প্রাচ্যবিদরা ইসলামের এই মহান খাদেমের উপর অভিযোগ আরোপ করেছে, তিনি উমাইয়া খলিফাদের নির্দেশে অনেক হাদীছ তৈরি করেছেন। প্রথমতঃ আমরা বলতে চাই, ইসলামের ইতিহাসে যত খিলাফত ছিল তন্মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনের পর সর্বশ্রেষ্ঠ খিলাফত ছিল উমাইয়াদের।

(ক) তারা কুরাইশ বংশের ছিলেন। তথা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বংশের ছিলেন।

(খ) রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী তারা সর্বশ্রেষ্ঠযুগের শাসক ছিলেন।[৯৩]

(গ) ইতিহাস সাক্ষী ইসলামী খিলাফতের সীমানা সবচেয়ে বেশী বিস্তৃত হয়েছিল তাদের শাসনামলে। পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ, চীন সাগর থেকে স্পেন পর্যন্ত আফ্রিকার জংগল থেকে ইউরোপের দরজা পর্যন্ত সব জায়গায় তাদের হাতে কালেমার পতাকা উড়ছিল। তারপর যত খিলাফাত এসেছে চাহে আব্বাসীয় খিলাফত হোক বা মামলূকীয় খিলাফাত বা ফাতেমীয় বা ওসমানীয় সেই সীমানা রক্ষা করতে করতেই পার হয়ে গেছে। কেউই ইসলামী খিলাফতের সীমানা বাড়াতে সক্ষম হয়নি। বরং তাদের সময়ে মুসলিমরা দুইবার বায়তুল মাক্বদিস হারিয়েছে। ক্রুসেডার ও মঙ্গোলীয়দের হাতে বিরাট ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে। স্পেন ও ভারত হারিয়েছে। চীনের জিনজিয়াং, ফিলিপাইনের মিন্দানাও, থাইল্যান্ডের পাত্তানী এবং ইউরোপের কসোভা ও তার আশে-পাশের রাষ্ট্রগুলো মুসলিমরা হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট যে ইসলামের বিজয়রথের জন্য মহান উমাইয়াদেরকেই বাছাই করেছিলেন।

৯৩. ছহীহুল বুখারী হা/২৬৫২।

(ঘ) ইসলামের ভ্রান্ত ফিরক্বাগুলোর দ্বারা প্রায় সব খিলাফতই প্রভাবিত ছিল শুধুমাত্র উমাইয়া খিলাফাত ছাড়া। আব্বাসীয় খিলাফতে মু'তাযিলা ফিরক্বা খিলাফাত পর্যন্ত পৌঁছে গেছিল। শুধু তাই নয় ইসলামের সকল ভ্রান্ত ফিরক্বার শত্রু হচ্ছে উমাইয়া খলীফাগণ। শিয়া-খারেজীদের চোখের শুল। তাদের অপপ্রচারের কারণেই মূলতঃ সাধারণ মুসলিম উমাইয়াগণের অবদান সর্ম্পকে অন্ধকারে থাকে। আর এটাকেই পূঁজি করে প্রাচ্যবিদরা হাদীছের ভাণ্ডারে সন্দেহের অভিযোগ উত্থাপন করার দুঃসাহস দেখায়।

(ঙ) উমাইয়া খিলাফতের অধীনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আবু হুরায়রা, আবু আইয়ূব আনসারী, আবু সাঈদ খুদরী, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) সহ মহান ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের উত্তরসূরী মহান তাবেঈনে এযাম জীবন যাপন করেছেন। বলা যায় উমাইয়া খিলাফতের উপর ছাহাবীগণের ইজমা ছিল।

(চ) উমাইয়া খলীফাগণের মধ্যে সবচেয়ে মহান ও মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন ওমর ইবনে আব্দুল আযীয। যাকে মুসলমানেরা ২য় ওমর ও ৫ম খলিফা রাশেদা নামে সম্মানের সাথে স্মরণ করে। এমনকি আব্বাসিরাও ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)-কে সম্মান করত। ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর তাক্বওয়া পরহেযগারিতার কথা দুনিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁর নির্দেশেই ইবুন শিহাব যুহরী (রহঃ) হাদীছ লিপিবদ্ধ করা শুরু করেন। শুধু তাই নয় উমাইয়া শাসন আমলে কুরআন-হাদীছের ইলমের যত খিদমাত হয় অন্য কোন সময় তত হয়নি। ইলম, আমল ও জিহাদের স্বর্ণ যুগ ছিল উমাইয়া খিলাফত আমল।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, উমাইয়া খলীফাগণকে প্রাচ্যবিদরা যেভাবে ইসলামের শত্রু প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে তা ডাহা মিথ্যা। সত্যি বলতে কি ইউরোপের বুকে পা উমাইয়ারাই রেখেছিল এইজন্য ইউরোপ জন্মগতভাবে উমাইয়াদের সহ্য করেনা। আল্লাহর রহমতের সাথে হিংসা করে কোন লাভ আছে কি? অন্যদিকে ইবনু শিহাব যুহরী (রহঃ)-এর উপর তারা যে আঙ্গুলী উত্তোলন করেছে তার জবাবে শুধুমাত্র মুহাদ্দিছগণের মন্তব্য পেশ করতে চাই।
ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, لم يبق احد اعلم بسنة 'যুহরীর চেয়ে হাদীছ সর্ম্পকে অভিজ্ঞ আর কেউ বাকী নেই'। তিনি বিভিন্ন সময় ইমাম যুহরী (রহঃ)-কে হাদীছ শাস্ত্রে সবচেয়ে অভিজ্ঞ বলেছেন।[৯৪]
ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, ماله في الدنيا نظير 'দুনিয়াতে যুহরীর দৃষ্টান্ত কেউ নেই'।[৯৫]

৯৪. জারাহ ওয়াত-তাদীল ৮/৭১-৭৪।

ইমাম মাকহুল (রহঃ) বলেন, ما بقى على ظهرها احد اعلم بسنة من ابن شهاب الزهري 'দুনিয়ার বুকে ইমাম যুহরীর চেয়ে হাদীছ সর্ম্পকে জ্ঞানী আর কেউ বেঁচে নেই'।[৯৬]

আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী (রহঃ) বলেন, ما رأيت أحدا أعلم من الزهري 'আমি যুহরীর চেয়ে জ্ঞানী কাউকে দেখিনি'।[৯৭]

তার মত স্মৃতি শক্তিসম্পন্ন মানুষ দুনিয়া খুব কমই দেখেছে। ইয়াহিয়া আল-কাত্তান (রহঃ) বলেন, তার কান যা শুনত তাই সংরক্ষণ করে রাখত।

ইবনু হিব্বান (রহঃ) বলেন,
احفظ أهل زمانه للسنن واحسنهم لها سياقا وكان فقيها فاضلا
'তার যুগে হাদীছের সবচেয়ে বেশী হাফিয এবং হাদীছ বর্ণনায় সবচেয়ে সুন্দর। আর তিনি সম্মানিত ফক্বীহ'।[৯৮]

ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার সম্পর্কে বলেন, الإِمَامُ العَلَمُ حَافِظُ زَمَانِه 'ইমাম, মহান ব্যক্তি, তার যুগের হাফিয।[৯৯]

এই ভাবে যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন। তার শান-শওকত, মর্যদা ও মযবূতির উপর পুরো মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত রয়েছে। সুতরাং তাঁর নামে প্রাচ্যবিদদের অভিযোগ ভিত্তিহীন ও হাদীছের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বৈ কিছুই নয়।

একজন রাবি কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের উপর সন্দেহের অভিযোগ খণ্ডন

যারা সরাসরি হাদীছে সন্দেহ সৃষ্টি করে না বা হাদীছ অস্বীকার করতে চায় না তারা হাদীছ অস্বীকার করার জন্য বিভিন্ন চোরাগলি অনুসন্ধান করে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'খবারে আহাদ' হাদীছকে আস্বীকার করা। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল-
হাদিস প্রধানত দুই প্রকার

(১) 'খবারে আহাদ' (خبر آحاد) ।

৯৫. প্রাগুক্ত।
৯৬. প্রাগুক্ত।
৯৭. প্রাগুপ্ত ।
৯৮. মাশাহির উলামায়িল আমছার, রাবী নং ৪৪৪।
৯৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/৩২৬।

(২) 'মুতাওয়াতির' (متواتر) ।

যে হাদীছের বর্ণনাকারীর সংখ্যা প্রতি যুগে অগণিত তাকে মুতাওয়াতির হাদীছ বলা হয়। আর যে হাদীছের কোন এক স্তরে বর্ণনাকারীর সংখ্যা একজন তাকে খবারে আহাদ বলা হয়।

মু'তাযিলা ফিরক্বার গুরু আবু আলী আল-জুব্বাঈ ও তার অনুসারীরা খবারে আহাদকে দলীলযোগ্যই মনে করেনা। তাদের কাছে দলীলযোগ্য হওয়ার জন্য কম সে কম প্রতি স্তরে দুই জন রাবী থাকতে হবে। তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একদল মানুষ খবারে আহাদকে সরাসরি অস্বীকার না করলেও খবারে আহাদকে গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন শর্তযুক্ত করে। যা প্রকারান্তরে হাদীছকে অস্বীকারের নামান্তর। জমহুর আয়েম্মায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনগণ হাদীছ ছহীহ হলেই তা গ্রহণ করতেন এবং তার উপর আমল করতেন।

মনে করুন! আপনি বিশ্বাস করেন লন্ডন নামে একটি শহর আছে অথচ আপনি লন্ডন শহর দেখেননি। কেননা জন্মের পর থেকে মানুষের মুখে, টিভি, পত্র-পত্রিকায় ও বইয়ের পাতায় এতবার লন্ডন নামটি শুনেছেন যার কারণে আপনি সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করেন লন্ডন নামে একটি শহর আছে। এটা হল খবারে মুতাওয়াতির। অন্যদিকে একজন আপনার পড়শী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঢাকার বুকে ছোট থেকে আপনাদের বেড়ে উঠা। আপনার বন্ধু ভদ্র, নম্র, পরহেযগার ও সত্যবাদী। তার মুখে আপনি বহুবার শুনেছেন তার গ্রামের নাম তেকানিচুকাইনগর। আপনি কোনরুপ সন্দেহ ছাড়াই বিশ্বাস করেন তেকানিচুকাইনগর নামে একটি গ্রাম আছে দুনিয়াতে। তা নিয়ে তার সাথে হাসাহাসি ও ঠাট্টাও করেন। এটা হল খবারে আহাদ। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট লন্ডন নামে একটি শহর থাকার বিষয়ে আপনার যতটুকু বিশ্বাস তেকানিচুকাইনগর নামে একটি গ্রাম থাকার বিষয়েও আপনার ততটুকু বিশ্বাস। সুতরাং বর্ণনার সত্যতা সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করেনা বরং বর্ণনাকারীর সততার উপর নির্ভর করে। এ উদাহরণের আলোকে বলতে চাই, খবারে আহাদ ছহীহ প্রমাণিত হওয়ার পরেও তা ধারণার ফায়দা দেয় এ কথা বলা যুক্তিতে টিকেনা। বরং খবারে আহাদ যদি ছহীহ হয় তাহলে তা খবারে মুতাওয়াতিরের অনুরুপ অকাট্য। এটাই সালাফগণের আক্বীদা। পরবর্তীতে মু'তাযিলা ও মুতাকাল্লিমীনদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক সম্মানিত ইমামও খবারে আহাদ ধারণার ফায়দা দেয় বলে মন্তব্য করেছেন যা দুঃখজনক।

খবারে আহাদ নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেয় এবং তার উপর আমল করতে হবে। নিম্নে এ বিষয়ে দলীল পেশ করা হল-

দলীল-১

খবর গ্রহণের মৌলিক শর্ত বিষয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

‘ওহে ঈমানদারগণ! যদি তোমাদের নিকট কোন ফাসেক্ব সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তোমরা তার সংবাদ যাচাই কর’ *(হুজরাত ৬)*। এ আয়াতে মহান আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ গ্রহণ ও বর্জনের ভিত্তি সংখ্যার উপর রাখেননি। তিনি বলেননি যদি তোমাদের নিকট একজন সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তোমরা যাচাই কর! আর যদি অগণিত মানুষ খবর নিয়ে আসে তাহলে তোমরা তা গ্রহণ কর! তিনি সংবাদ গ্রহণ ও বর্জনের ভিত্তি সংবাদ দানকারীর সততা, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়নতার উপর রেখেছেন। আর সত্যি বলতে কি, বাস্তবেই যদি যুক্তির আলোকে একজনের প্রদত্ত সংবাদ ধারণা প্রবণ হয়ে থাকে তাহলে তো পুরো ইসলামী শরীয়ত ধারণা প্রসূত। কেননা এই শরীয়তের আনয়ন কারী শুধু মাত্র একজন ব্যক্তি। মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার উপর ভিত্তি করেই মানুষ তাঁকে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছে তাঁর সংখ্যাধিক্যের কারণে নয়। সুতরাং সংবাদের সত্য মিথ্যার মাপ কাঠি সংখ্যা নয় বরং ঐ সংবাদদানকারী ব্যক্তির সততা ও বিশ্বস্ততা।

দলীল- ২

মহান আল্লাহ বলেন,

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ - فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

‘আর শহরের প্রান্ত থেকে একজন ব্যক্তি আসল। সে মূসা (আঃ)-কে বলল, হে মূসা! নিশ্চয় সেনাবাহিনী তোমাকে খুঁজছে তোমাকে হত্যা করবে তাই। তুমি এই শহর থেকে বের হয়ে যাও! আমি তোমার কল্যাণ চাই। অতঃপর মূসা (আঃ) সেখান থেকে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন তিনি বললেন ,হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে অত্যাচারী ক্বওম থেকে নাজাত দিন! *(কাসাস ২০)*।

এখানে মূসা (আঃ) শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির প্রদত্ত খবরকে বিশ্বাস করেছেন। আর তার এই বিশ্বাসকে কুরআন স্বীকৃতিও দিয়েছে। তাহলে কি মুনকিরীনে হাদীছগণের মূলনীতি অনুযায়ী মুসা (আঃ)-কে এই খবারে আহাদে বিশ্বাস না করে সন্দেহ করা উচিৎ ছিল?

দলীল-৩

মহান আল্লাহ বলেন, وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ‘হুদহুদ বলল, আর আমি সাবা‘ জাতির সংবাদ নিয়ে এসেছি’ *(নামল ২২)*। এ আয়াতে সুলায়মান (আঃ) মানুষ তো দূরের কথা শুধুমাত্র একজন পাখির প্রদত্ত খবরে বিশ্বাস করেছেন।

দলীল-৪

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ أَلاَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ.

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘আমি আবু ত্বলহার বাড়ীতে মানুষ-জনকে মদ পান করাচ্ছিলাম ইতিমধ্যেই একজন আগমনকারী ঘোষণা দিল, ‘ সাবধান! মদ হারাম করা হয়েছে’ । তখন আবু ত্বলহা আমাকে বললেন বের হও! এবং মদের মটকা গুলো ভেঙ্গে দাও! আমি বের হলাম এবং তা ভেঙ্গে দিলাম। অতঃপর তা মদীনার অলি-গলিতে প্রবাহিত হল’।[১০০]

এ ঘটনায় শুধুমাত্র একজনের প্রদত্ত সংবাদ গ্রহণ করে তারা মদপান থেকে বিরত হয়েছিলেন শুধু তাই নয় মদের মটকা ভেংগে মদীনার অলি-গলি প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন।

দলীল-৫

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘মানুষ কুবায় ফজরের ছালাত আদায় করছিল। ইতিমধ্যেই একজন এসে বলল, নিশ্চয় রাসূল (ছাঃ)-এর উপর আজ রাতে কুরাআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং কাবার দিকে মুখ ফিরে ছালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তোমরা ক্বিবলা মুখী হও! মুসল্লীদের মুখমন্ডলী সিরিয়ামুখী ছিল সাথে সাথে তারা কাবার দিকে ফিরে গেল।[১০১]

তাহক্বীক্ব : সনদ ছহীহ।

দলীল-৬

রাসূল (ছাঃ) নাজরান বাসীর নিকট উবায়দা (রাঃ)-কে এবং ইয়ামানবাসীর নিকট মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) সহ আরবের বিভিন্ন প্রান্তে দ্বীন শিখানোর জন্য

১০০. বুখারী হা/৭২৫৩।
১০১. মুসনাদে আহমাদ হা/৫৯৩৪।

এবং বাদশাহদের নিকট ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত নিয়ে একজন করে ছাহাবী পাঠিয়েছিলেন। ইতিহাসে তার প্রমাণ বেহিসাব। একজনের প্রদত্ত খবর সেই এলাকাবাসীদের মানা ঐরকমই ছিল। না হলে তারা কাফের হয়ে যেত।

দলীল-৬

পৃথিবীর পুরো সমাজ ব্যবস্থা একজন ব্যক্তির প্রদত্ত সংবাদের উপর ভিত্তি করে চলছে। স্ত্রীর একক প্রদত্ত সংবাদ স্বামী বিশ্বাস করছে। ছেলের একক প্রদত্ত সংবাদে পিতা টাকা পাঠাচ্ছে। যদি একজন ব্যক্তির প্রদত্ত সংবাদের উপর সন্দেহের আংগুল তোলা হয় তাহলে পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে।

দলীল-৮

যারা খবারে আহাদকে পরিত্যাগ করতে চায় বা দুর্বল করতে চায় তাদের উপর জরুরী নিজেদের এ দাবী মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত করে। অন্যথায় তাদের এ দাবী তাদের মূলনীতি অনুযায়ী ধারণা বৈ কিছুই নয়।

দলীল-৯

মহান আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র কুরআনে দুইজন সাক্ষীর উপর ভিত্তি করে চোরের হাত কাটার হুকুম দিয়েছেন। আর দুইজন প্রদত্ত সংবাদ মুতাওয়াতির নয়। খবারে আহাদ অস্বীকারকারীদের জন্য কুরআনের অত্র আয়াত অস্বীকার করা যরুরী।

দলীল-১০

ইমাম বুখারি (রহঃ) তাঁর কিতাব শুরু করেছেন 'খবারে আহাদ' দিয়ে এবং শেষও করেছেন 'খবারে আহাদ' দিয়ে। তিনি এর দ্বারা যারা খবারে আহাদকে অস্বীকার করে তাদেরকে হেদায়েত করার চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয় তিনি তার ছহীহ বুখারীতে খবারে আহাদের উপর আমল করার প্রমাণে একটি আলাদা অধ্যায়নই রচনা করেছেন।

রাসূল (ছাঃ) কি একজন রাবীর প্রদত্ত খবর গ্রহণ করেননি?

যারা খবারে আহাদকে অস্বীকার করতে চায় বা তাতে দুর্বলতা সৃষ্টি করতে চায় তারা একটি ঘটনা থেকে দলীল গ্রহণ করে থাকে। হাদীছটি হচ্ছে, একদা রাসূল (ছাঃ) ৪ রাকা'আত ছালাতের জায়গায় দুই রাকা'আত ছালাত আদায় করলেন। ছালাম ফিরানো শেষে যুল ইয়াদায়ন নামক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন না ছালাত কমিয়ে দেয়া হয়েছে? রাসুল (ছাঃ)-এর নিকট যদি একজনের

প্রদত্ত সংবাদ দলীলযোগ্য হত তাহলে তিনি সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গিয়ে ছালাত পূর্ণ করে নিতেন। কিন্তু তিনি তা না করে উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ 'যুল ইয়াদায়ন যা বলছে ঘটনা কি তাই? তখন ছাহাবায়ে কেরাম সম্মতি দিলে তিনি ছালাত পূর্ণ করেন'।[১০২]

তাদের এ দলীলের জবাবে বলতে চাই, এ ঘটনায় যুল ইয়াদায়ন স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-কে তার নিজস্ব কর্মের ব্যাপারে সংবাদ দিচ্ছিল। আর মানুষ তার নিজস্ব কর্মের ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় বেশী জ্ঞান রাখে। যদি যুল ইয়াদায়ন অন্য কারো ব্যাপারে সংবাদ প্রদান করত আর রাসূল (ছাঃ) তা গ্রহণ না করতেন তাহলে দলীল গ্রহণ ঠিক ছিল। মনে করেন, আপনাকে এসে কেউ বলছে আপনি দুপুরে খাননি। তার এ দাবী আপনি সহজেই গ্রহণ করবেন না কেননা আপনার সর্ম্পকে আপনি বেশী ভাল জানেন। অনুরুপ রাসূল (ছাঃ) ছালাত ২ রাকা'আত পড়েছেন না ৪ রাকা'আত পড়েছেন এটা রাসূল (ছাঃ)-ই ভাল জানেন। এই জন্যই মূলতঃ রাসূল (ছাঃ) যুল ইয়াদায়নের দাবী প্রথম চান্সেই গ্রহণ করেননি। কেননা যুল ইয়াদায়নের প্রদত্ত সংবাদ রাসূলের নিশ্চিত বিশ্বাসের বিরোধী হচ্ছিল। রাসূল নিশ্চিত ছিলেন তিনি ৪ রাকা'আত আদায় করেছেন। সুতরাং এ ঘটনা থেকে খবারে আহাদের মাসালায় দলীল গ্রহণ বোকামী বৈ কিছুই নয়।

বাস্তবতা :

সত্যি বলতে কি, মুতাওয়াতির ও খবারে আহাদ পরবর্তীতে আবিস্কৃত হাদীছের প্রকার। পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণের নিকট হাদীছের মাত্র দু'টি প্রকারই ছিল ছহীহ ও যঈফ। আর বাস্তবেই হাদীছের দু'টি প্রকার ছহীহ ও যঈফ। ছহীহ হাদীছ অকাট্য জ্ঞানের ফায়দা দেয় চাহে তা মুতাওয়াতির হোক বা খবারে আহাদ হোক। আর যঈফ হাদীছ ধারণার ফায়দা দেয়।

বিজ্ঞান ও হাদীছ

হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর বিষয়ে সন্দেহবাদীদের একদল আছে যারা হাদীছকে নিজেদের যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে পরীক্ষা করতে চায়। বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে হাদীছকে ওজন করে। যুক্তির ধোপে টিকলে তারা হাদীছ গ্রহণ করে। বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হলে তারা হাদীছ মানে। অন্যথায় যে হাদীছগুলো যুক্তি ও বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে তাদের কাছে ভুল মনে হয় সেগুলোকে তারা পরিত্যাগ করে।

১০২. ছহীহুল বুখারী হা/৪৮২।

একদল তো সে হাদীছগুলোকে ইসলামের উপর আক্রমণ করার কাজে ব্যবহার করে। তাদের জবাব নিম্নে প্রদত্ত হল,

বিজ্ঞান আহামরী কিছু নয় :

মুসলিমরা আজ বিজ্ঞান ফোবিয়ায় ভোগে। কুরআনের কোন একটা আয়াত বিজ্ঞান বিরোধী মনে হলে সেটা নিয়ে টেনশনে পড়ে যায়। হীনম্মন্যতায় ভোগে। আবার কুরআনের কোন আয়াত বিজ্ঞানের সাথে মিলে গেলে ১৪০০ বছর আগে কুরআন জানিয়েছে বলে বুকটা কয়েক ইঞ্চি ফুলিয়ে তুলে। নিজেকে সান্তনা দেয়ার জন্য বা তাৎক্ষনিক জবাব দেয়ার জন্য এগুলো একটা অস্থায়ী সমাধান হতে পারে। কিন্তু স্থায়ী সমাধান কখনোই নয়।

স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রথমত আমাদেরকে বিজ্ঞানফোবিয়া থেকে বের হয়ে আসতে হবে। বিজ্ঞান আহামরী কিছু নয়। আমরা জানি, মানুষের বিবেক সীমিত। মানুষ যেমন অতীতের সব ঘটনা জানেনা। তেমনি আগামীকাল কি হবে তাও জানেনা। কিছুক্ষণ পর কি করবে তাও জানেনা। তেমনি বিজ্ঞানও জানেনা। বিজ্ঞানের জ্ঞানও সীমিত। বিজ্ঞান যতই উন্নত হোক কোনদিন বলতে পারবে না মানুষ কখন কোথায় কিভাবে মারা যাবে। কেননা বিজ্ঞান অলৌকিক কিছু নয়। মানুষের গবেষণা মাত্র। বিজ্ঞান আসমান থেকে পড়া কোন অমীয় বাণী নয়। বিজ্ঞানকে মানুষ জন্ম দিয়েছে। অক্ষম ও অজ্ঞ মানুষ কিভাবে সবজান্তা বিজ্ঞানের জন্ম দিতে পারে? মানুষ মাত্রই ভুল করে সেহেতু স্বভাবজাত ভাবেই মানুষের আবিস্কৃত বিজ্ঞানও ভুল করবে। হয়েছেও তাই। সকাল-সন্ধ্যায় বিজ্ঞান তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। অতএব একথা দিনের আলোর ন্যায় সত্য যে, বিজ্ঞান ও মানুষের বিবেক কোনটাই অকাট্য সত্যের প্রমাণ বহন করেনা। সুতরাং বিজ্ঞান ও যুক্তি নিয়ে লাফালাফি বোকামী বৈ কিছু নয়।

দ্বিতীয়ত: আজ বিজ্ঞান অমুসলিমগণের দখলে। এই জন্য আমাদের কাছে মনে হয় বিজ্ঞান না জানি কি! আমাদের ঘরে বিজ্ঞানী গড়ে তুলতে হবে। আমাদেরকেও বিজ্ঞানের চর্চা করতে হবে। যেদিন আমরা বিজ্ঞানে রাজত্ব করব সেদিন মনে হবে এসব থিউরীতো আমিও তৈরি করতে পারি। আজকে যে থিউরীগুলোকে আমরা কুরআনের সমতুল্য করার চেষ্টা করছি সে থিউরীগুলোকে হাতের ময়লা মনে হবে।

কুরআনের কিছু আধুনিক মু'জিযা :

কুরআন যে আল্লাহর অহী তা কুরআন নিজেই চ্যালেঞ্জ করে গত ১৪০০ বছর থেকে বলে আসছে। কুরআনের সাহিত্যিক মানের মত একটি ছোট্ট সূরাও সারা

দুনিয়ার মানুষ মিলে তৈরি করতে পারবে না। কুরআনের মু'জিযায় নতুন পালক হিসেবে যুক্ত হয়েছে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিস্কার। বিজ্ঞান আজ যেটা আবিস্কার করছে একজন আরবের নিরক্ষর মানুষ মরুভূমিতে বসে তা ১৪০০ বছর আগে বলেছেন। যার কিছু উদাহরণ নীচে পেশ করা হল-

(১) বিজ্ঞান কিছুদিন আগে জেনেছে চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূরা ফুরক্বানের ৬১ নং আয়াতে কুরআনে এই কথা বলা হয়েছে প্রায় ১৪০০ বছর আগে।

(২) বিজ্ঞান মাত্র দুইশত বছর আগে জেনেছে চন্দ্র এবং সূর্য নিজ নিজ কক্ষ পথে ভেসে চলে। সূরা আম্বিয়া ৩৩ নং আয়াতে কুরআনে এই কথা বলা হয়েছে প্রায় ১৪০০ বছর আগে।

(৩) সূরা কিয়ামাহ'র ৩ ও ৪ নং আয়াতে ১৪০০ বছর আগেই জানানো হয়েছে; মানুষের আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে মানুষকে আলাদা ভাবে সনাক্ত করা সম্ভব। যা আজ প্রমাণিত।

(৪) 'বিগ ব্যাং' থিওরি আবিষ্কার হয় মাত্র চল্লিশ বছর আগে। সূরা আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতে কুরআনে এই কথা বলা হয়েছে প্রায় ১৪০০ বছর আগে।

(৫) পানি চক্রের কথা বিজ্ঞান জেনেছে বেশি দিন হয়নি সূরা যুমার ২১ নং আয়াতে কুরআন এই কথা বলেছে প্রায় ১৪০০ বছর আগে।

(৬) বিজ্ঞান এই সেদিন জেনেছে লবণাক্ত পানি ও মিষ্টি পানি একসাথে মিশ্রিত হয় না। সূরা ফুরকানের ২৫ নং আয়াতে কুরআন এই কথা বলেছে প্রায় ১৪০০ বছর আগে।

(৭) পৃথিবীতে রাত এবং দিন বাড়া এবং কমার রহস্য মানুষ জেনেছে দুইশত বছর আগে। সূরা লুকমানের ২৯ নং আয়াতে কুরআন এই কথা জানিয়ে গেছে প্রায় দেড় হাযার বছর আগে!

এই রকম বহু উদাহরণ রয়েছে যা বিজ্ঞান আজ জানলেও কুরআন তা জানিয়েছে ১৪০০ বছর আগে। এ ঘটনাগুলো যেমন কুরআনের সৃষ্টিকর্তার বাণী হওয়ার প্রমাণ বহন করে তেমনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সত্য নবীর হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

হাদীছের কিছু আধুনিক মুজিযা :

হাদীছ শাস্ত্রে বর্ণিত সন্দেহাতীতভাবে ছহীহ একটি হাদীছও বিজ্ঞান ও যুক্তি বিরোধী হতে পারে না। আমাদের বিজ্ঞান ও যুক্তি সাময়িকভাবে তাকে অচল

প্রমাণ করতে চাইলে সেটা যুক্তি ও বিজ্ঞানের দুর্বলতা অথবা আমাদের বুঝার ভুল। প্রত্যেক যে জিনিসের আদেশ রাসূল (ছাঃ) দিয়েছেন তার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে আর প্রত্যেক যে বিষয় থেকে তিনি নিষেধ করেছেন তাতে সার্বিক অকল্যাণ রয়েছে। তিনি মদকে হারাম করেছেন চিকিৎসা বিদ্যা প্রমাণ করেছে মদপান লিভারের জন্য ক্ষতিকর। তিনি রক্তকে হারাম করলেও কলিজার মত রক্তপিন্ডকে হালাল করেছেন। আজ বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে কলিজাতে কি পরিমাণ ভিটামিন রয়েছে। তিনি সামুদ্রিক মাছ খাওয়া হালাল করেছেন; আজ বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে সামুদ্রিক মাছে কি পরিমাণ ভিটামিন রয়েছে। তিনি আমাদেরকে ডান দিকে ফিরে ঘুমাতে উৎসাহিত করেছে; বিজ্ঞান এখন বলছে ডান দিকে ফিরে ঘুমালে হার্ট সব থেকে ভাল থাকে। তিনি ১৪০০ বছর আগে কিভাবে জানলেন মানুষের হার্ট ডান দিকে থাকে। তিনি হিংস্র প্রাণীর গোশত হারাম করেছেন; বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করেছে হিংস প্রাণীর গোশত হার্টের জন্য ক্ষতিকর। তিনি কালোজিরাকে সকল রোগের ঔষুধ বলেছেন; বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করছে কালোজিরা কতটা উপকারী। তিনি ১৪০০ বছর আগে কিভাবে কালোজিরার উপকারিতা জানলেন? তিনি মিসওয়াকের প্রতি সীমাহীন গুরুত্ব দিয়েছেন; বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করেছে ব্রাশের চেয়ে মিসওয়াক দাঁতের জন্য বেশী উপকারী। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিটি সুন্নাতের সাথে বিজ্ঞানের ওতপ্রোত সর্ম্পক নিয়ে ড. তারেক মাহমুদের কয়েক খণ্ডের আলাদা একটি বইই আছে ‘সুন্নতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান’ নামে।

মাছির হাদীছ ও ঠাট্টাকারীদের মুখে কালিমা লেপন :

যে সমস্ত হাদীছ নিয়ে নাস্তিক্যবাদী ও প্রাচ্যবিদরা এবং তাদের খুঁদ কুড়ে খাওয়া কিছু মুসলিমের অভিযোগ ছিল তার মধ্যে অন্যতম একটি হাদীছ হচ্ছে- রাসূল (ছাঃ) বলেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءًز

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যদি কোন মাছি তোমাদের কারো পাত্রে পড়ে যায় সে যেন মাছিকে তার পাত্রে ডুবিয়ে ধরে অতঃপর ছেড়ে দেয়। কেননা মাছির এক পাখায় রোগ আছে আরেক পাখায় আরোগ্য’।[১০৩]

১০৩. ছহীহুল বুখারী হা/৩৩২০।

যেহেতু বিজ্ঞান ও ডাক্তারী বিদ্যার মাধ্যমে আমরা জানি যে, মাছি রোগ জীবানু বহন করে এবং স্থানান্তরিত করে। মাছির কারণে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু হয়। মাছির ডানায় রোগ জীবানু রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিজ্ঞান ও ডাক্তারের এই প্রমাণের পর হাদীছ বিরোধী সমাজ রাসূল (ছাঃ)-এর এ হাদীছের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। যার যে উদ্দেশ্য ছিল সে তা প্রমাণ করতে থাকে। কেউ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ভন্ড নবী কেউবা হাদীছ শাস্ত্রে সন্দেহ আর কেউবা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর উপর হামলা করে। কেননা এ হাদীছের বর্ণনাকারী ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

কিন্তু আল হামদুলিল্লাহ মুসলিম বিজ্ঞানীরা একটি মহান কাজ করেছেন। এ হাদীছের বাস্তবতা পরীক্ষার জন্য গবেষণা শুরু করেন। কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের উস্তাদ ড. ওয়াজিহ বায়েশরী এবং আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উস্তাদ ড. মুস্তফা হাসান সহ বিজ্ঞানীদের একটি টিম এ বিষয়ে পরীক্ষা চালান। জীবানুমুক্ত কিছু পাত্রের মাধ্যমে মাছির বাজার থেকে কয়েকটি মাছি ধরে নিয়ে জীবানুমুক্ত টেষ্ট টিউবের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন। তারপর নলটি একটি পানির পাত্রে উপুড় করেন। মাছিগুলো পানিতে পতিত হয় । উক্ত পানি থেকে কয়েক ফোটা পানি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে, সেই পানিতে অসংখ্য জীবানু রয়েছে। তারপর জীবানুমুক্ত একটি সূঁচ দিয়ে মাছিকে ঐ পানিতেই ডুবিয়ে ধরেন। তারপর কয়েক ফোটা পানি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে, সেই পানিতে আগের মত আর জীবানু নেই, বরং কম। তারপর আবার ডুবিয়ে ধরেন। তারপর কয়েক ফোটা পানি নিয়ে আবার পরীক্ষা করেন। এমনিভাবে কয়েকবার পরীক্ষা করেও দেখেন যে, যতবার মাছিকে ডুবিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন ততই জীবানু কমেছে। পরবর্তীতে তাদের গবেষণা রিপোর্টটি বিস্তারিত বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বইয়ের নাম 'আদ-দাউ ওয়াদ-দাওয়া ফি জানাহায়িইয-যুবাব' الداء والدواء في جناحي الذباب। ফালিল্লাহিল হামদ। এ হাদীছ যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর মু'জিযা তেমনি আমাদের সামনে থাকা হাদীছ ভাণ্ডারের মু'জিযা তেমনি আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে যারা অভিযুক্ত করে তাদের মুখে কালিমা লেপন।

একটি প্রশ্ন :

আমরা যদি মেনেই নিই কুরআন ও হাদীছকে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মাপতে হবে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, কার বিবেক-বুদ্ধিকে মানদন্ড হিসেবে ধরব? চিকিৎসা বিদ্যা? দর্শন শাস্ত্র? যুক্তিবিদ্যা? বিজ্ঞান? একটা আরেকটা থেকে আলাদা। আমরা কোনটাকে সত্যের মানদন্ড বলব? একটি হাদীছ একজনের বিবেকে ধরতে পারে আরেকজনের বিবেকে ধরে না। একজনের শাস্ত্র অনুযায়ী ঠিক মনে হতে পারে আরেকজনের শাস্ত্র অনুযায়ী ভুল প্রমাণিত হতে পারে।

এটাই স্বাভাবিক। আমরা কুরআন ও হাদীছকে এই ভাবে খেলনা বানাতে পারি না। বরং কুরআন ও ছহীহ হাদীছই একমাত্র সত্যের উৎস; কেননা তা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। যে বিজ্ঞান আজ কুরআন-হাদীছের বিরোধিতা করছে সেই বিজ্ঞানই একদিন ভুল প্রমাণিত হবে। এটাই নিশ্চিত। আর হচ্ছেও তাই। যেখানে কুরআন ও হাদীছের সামনে আধুনিক বিজ্ঞান ও উন্নত ডাক্তারী বিদ্যা আত্মসমর্পণ করছে সেখানে কোন প্রকার দলীল ও প্রমাণ ছাড়াই যুক্তিবিদ ও দার্শনিক নামের কিছু উদ্ভট মস্তিষ্ক থেকে নির্গত অভিযোগের কিইবা গুরুত্ব থাকতে পারে? সুতরাং নিজের বিশ্বাসকে দুর্বল করে ঈমান হারানোর মত বোকামী করার প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য যে নাস্তিকদের নগ্ন হামলায় আধুনিক তরুণ সমাজ দিশেহারা। সময়ের দাবী হচ্ছে তাদের প্রতিটি অভিযোগ ও ভিত্তিহীন উদ্ভট দাবীর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া। মহান আল্লাহ আমাদের সেই তাওফিক্ব দান করুন!

নিজের আমলকে ধ্বংস করিয়েন না!

পরিশেষে বলতে চাই একজন মু'মিন তখনই প্রকৃত মু'মিন যখন সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশকে কোন প্রকার কারণ অনুসন্ধান করা ছাড়াই মানে। যারা কারণ অনুসন্ধান করে তাদের ঈমানে দুর্বলতা আছে। প্রতিটি মু'মিনের বিশ্বাস হবে পাহাড়ের মত অটল। লোহার মত অবিচল। কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ অকাট্য এই বিশ্বাস নিয়ে জীবন দিতে পারার নাম ঈমান। উদ্ভট কিছু যুক্তি ও বিজ্ঞানের কিছু থিউরী নিয়ে দিশেহারা হওয়ার নাম ঈমান নয়। ইসলাম কভু বিবেক বিরোধী ও বিজ্ঞান বিরোধী নয়। বরং আমাদের বিবেকে ত্রুটি আছে। বিজ্ঞানে ত্রুটি আছে। চিকিৎসা বিদ্যায় ত্রুটি আছে। এর নাম আত্মসমর্পন। এর নাম মুসলিম হওয়া। যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যে নিজেদের বিবেক পরিচালনা করে তারা প্রকৃত মু'মিন ও মুসলিম নয় বরং মুনাফিক্ব মুসলিম। আপনি যদি ছালাত আদায় করার সময় কল্পনা করেন ছালাত আদায় করলে ব্যায়াম হয়। শারীরিক অনেক উপকার আছে। তাহলে আপনার এই ছালাত গ্রহণযোগ্য নয়। এই ছালাত ইখলাসবিহীন ছালাত। আপনাকে মনে করতে হবে মহান আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তাই ছালাত আদায় করছি। শুধুমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্য। তবেই আপনার ইবাদাত কবুল হবে। সুতরাং বিজ্ঞান ও যুক্তি খুঁজতে গিয়ে নিজের আমল নষ্ট করিয়ন না।

যুক্তির বেড়াজালে হাদীছ

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা প্রমাণ করেছি মানুষের বিবেক ও যুক্তি সত্যের মাপকাঠি নয়। এই জন্য শরীয়তে কুরআন-হাদীছের মুকাবিলায় যুক্তির বিন্দুমাত্র স্থান নেই। হাদীছ পাওয়ার পর বিবেক দিয়ে প্রশ্ন করা ও যুক্তির আলোকে তা যাচাই করার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি অনেকেই

যুক্তির বিচারে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে অস্বীকার করেন। অথচ ইসলাম যুক্তি ও রায় দিয়ে চলেনা। যেমন-

উদাহরণ-১

আলী (রাঃ) বলেন,

لو كانَ الدينُ بالرَّأي لكانَ أسفَلُ الخُفِّ أولى بالمَسحِ مِن أعلاه وقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمسَحُ على ظاهِرِ خُفَّيهِ.

'দ্বীন যদি মস্তিষ্ক প্রসূত রায় দিয়ে চলত তাহলে মোজার নীচের অংশ মাসাহ করা বেশী উচিৎ হত উপরের অংশের চেয়ে । (কেননা ময়লা নীচের অংশেই লাগে)। অথচ আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি তিনি তার মোজার উপরের অংশে মাসাহ করেছেন।[১০৪]

তাহক্বীক্ব : সনদ ছহীহ

মূলতঃ উম্মতে মুসলিমার সহজতার জন্য রাসূল (ছাঃ) এমনটি করেছেন। পায়ের নীচের অংশে মাসাহ করলে তা ভিজে গিয়ে ময়লার সাথে মিশে গিয়ে এক বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করবে কিন্তু উপরে মাসাহ করলে তা যেমন মাসাহকারীর জন্য সহজ তেমনি কোনরুপ বিব্রত অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা নেই।

উদাহরণ-২

যুক্তি অনুযায়ী হাতের প্রতিটি আঙ্গুলের উপকারিতা সমান নয়। বৃদ্ধ আঙ্গুলি ছাড়া বাকী ৪টি আঙ্গুল অচল প্রায়। কিন্তু অনামিকা আঙ্গুল ছাড়াও বৃদ্ধাঙ্গুলি ও বাকী তিনটি আঙ্গুলের সহযোগিতায় অনেক কাজ করা যাবে। সুতরাং যুক্তি অনুযায়ী আঙ্গুলের রক্তমূল্য তার উপকারিতা অনুযায়ী আলাদা আলাদা হওয়া চাই। কিন্তু ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রতিটি আঙ্গুলের রক্ত মূল্য ১০টি উট। কাজী শুরায়হের দরবারে যুক্তির আলোকে এ অভিযোগ উত্থাপন করা হলে তিনি বলেন, وَيْحَكَ إِنَّ السُّنَّةَ منعت الْقِيَاس اتبع وَلَا تبتدع 'তোমার ধ্বংস হোক! নিশ্চয় সুন্নাত ক্বিয়াসের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। অনুসরণ কর! বিদআত সৃষ্টি করিওনা'![১০৫]

তাহক্বীক্ব : সনদ ছহীহ।

মূলতঃ ইসলামী শরীয়ত প্রয়োজন ও উপকারের উপর ভিত্তি করে মানুষের কোন অঙ্গকে অবমূল্যায়ন করতে চায় না। মানুষের সম্মান মহান আল্লাহর নিকট

১০৪. আবু দাঊদ হা/১৬২।
১০৫. ফাতহুল বারী ১২/২২৬।

সবচেয়ে বেশী। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষকে আঘাত করা, অত্যাচার করা মহা অন্যায়। এই জন্য বৃদ্ধাঙ্গুল কাটা ইসলামে যেমন অপরাধ কণিষ্ঠ আঙ্গুল কাটাও তেমনি অপরাধ।

সুতরাং মানুষের দৃষ্টিতে ইসলামের কোন বিধান যুক্তি বিরোধী মনে হলে এটা মানুষেরর বিবেকের দুর্বলতা। মহান আল্লাহ এমন কল্যাণকে সামনে রেখে সেই বিধান নির্ধারণ করেছেন যা মানুষের বিবেক ধরতে অক্ষম। সুতরাং যুক্তি ও বিবেক দিয়ে ছহীহ হাদীছ বিচার করা বোকামী বৈ কিছুই নয়।

হাদীছে বর্ণিত মু'জিযা :

রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত মুজিযাগুলোকে যুক্তির আলোকে একদল মানুষের নিকট অবাস্তব মনে হয়। কিভাবে দশ জনের খাবার শত মানুষ খায়? কিভাবে এক বদনা পানিতে রাসূল হাত ডুবান আর ঝর্ণা সৃষ্টি হয়ে যায়? শত শত মানুষ অজু করে! কিভাবে এক রাতে মক্কা থেকে বায়তুল মাক্বদাস হয়ে সাত আসমান সফর করা যায়? স্যার সাইয়েদ আহমাদ সহ অনেকেই এই জাতীয় মু'জিযাকে অস্বীকার করেছেন। তাদের জবাবে বলতে চাই,

(ক) যুক্তি দিয়ে মু'জিযা বিচার করলে সর্বাগ্রে কুরআন অস্বীকার করতে হবে। মহান আল্লাহ বলছেন, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ তথা 'আমরা বললাম ওহে আগুন! তুমি ঠান্ডা এবং নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহিমের প্রতি' *(আম্বিয়া ৬৯)।* এই আয়াত কস্মিন কালেও বিবেকে ধরেনা। যেখানে আগুনের কাজ হচ্ছে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়া সেখানে কিভাবে সেই আগুন অন্যের জন্য ঠান্ডা ও নিরাপদ হতে পারে? কুরআনে এই রকম শত ঘটনা মহান আল্লাহ নিজে বর্ণনা করেছেন যেগুলো প্রমাণ বহন করে মু'জিযার বাস্তবতা আছে।

(খ) আমাদের সামনে আমরা বিভিন্ন কাজ ঘটার যে কারণ দেখতে পাই সেই কারণেরও সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ। আগুন লাগলে জ্বলে। জ্বলার কারণ আগুন। কিন্তু সেই আগুনেরও সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ। বৃষ্টির কারণ মেঘ। মেঘ ছাড়া বৃষ্টি হয় না। কিন্তু সেই মেঘেরও সৃষ্টি কর্তা মহান আল্লাহ। এই জন্য মেঘ জমা হলেই সব সময় বৃষ্টি হয় না। কেননা মহান আল্লাহ নির্দেশ দেননি তাই।

সুতরাং সবসময় কারণ পাওয়া গেলেই ফলাফল পাওয়া যাবে এমনটি নয়। কারণ ছাড়াও ফলাফল পাওয়া যেতে পারে আবার কারণ থাকলেও ফলাফল নাও পাওয়া যেতে পারে। আমরা মানুষরা কি থেকে তৈরি? শুক্র কীট থেকে। কিন্তু অতীতে যেতে যেতে অবশ্যই মানুষের একটা শেষ আসবে। বিরতিহীন কাল যাবত অতীতে চলতে পারে না। অবশ্যই একটা শুরু আছে। সেই শুরুটা কি

থেকে? সেটা অবশ্যই শুক্রকীট থেকে নয়। কেননা শুক্রকীট থেকে হলে আবার মানুষ লাগবে। এইভাবে বিরতিহীন ভাবে চলতে থাকবে। যা অসম্ভব। কুরআন, তাওরাত ও ইঞ্জীলের বাণী অনুযায়ী তিনি আদম (আঃ) যাকে মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তথা তার জন্য সেই কারণ প্রযোজ্য নয় যা আমাদের জন্য প্রযোজ্য । এই যে গাছের বীজগুলো। এদের একটা শেষ আছে। আমরা বলতে পারি না অনন্তকাল থেকে গাছ আছে। তার থেকে বীজ হয়েছে। আবার গাছ হয়েছে আবার বীজ হয়েছে। সুতরাং এই গাছগুলোর যেখানে শেষ সেখানে গাছগুলো অস্তিত্বে আসার জন্য সেই কারণ পাওয়া যাবে না যা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং স্বাভাবিক কারণ না পাওয়ার দরূন মু'জিযা অস্বীকার করা যুক্তির ধোপে টিকে না। মহান আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন।

মূলনীতির বেড়াজালে হাদীছ :

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে ফিক্বহী কিছু মূলনীতির কারণেও হাদীছ অবহেলিত হয়। বিশেষ করে আহলুর-রায়গণ নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির কিছু ফাতাওয়াকে সামনে নিয়ে এবং কুরআনের কিছু আয়াত ও কিছু হাদীছকে সামনে নিয়ে নিজের বিবেক-বুদ্ধি ও রায়-ক্বিয়াস দিয়ে পুরো ইসলামী শরীয়তের জন্য সামগ্রিক কিছু মূলনীতি তৈরি করেছেন। আইনের কিছু ধারা তৈরি করেছেন। পরবর্তীতে যত মাসায়েলই আসুক তারা নিজেদের বানানো এই মূলনীতির আলোকে ফৎওয়া প্রদান করে থাকেন। ফলত অটোমেটিক সুন্নাহ তাদের নিকট অবহেলিত হয়ে যায়। নিজেদের বানানো উসূলের বিরোধী কোন হাদীছ পেলেই তারা সর্বশক্তি দিয়ে সেই হাদীছটিকে অচল করার জন্য হামলে পড়েন। অন্যদিকে জমহুর মুহাদ্দিছ ও সালাফগণ যে কোন মাসালার সমাধান সর্বপ্রথম কুরআন ও হাদীছে খুজেন এবং আপ্রাণ চেষ্টা করেন সরাসরি কুরআন ও হাদীছ থেকে ফৎওয়া প্রদানের জন্য। নিম্নে এই জাতীয় কিছু মূলনীতি পেশ করা হল যার ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ অবহেলিত হয় -

মূলনীতি ১-

কুরআনের আয়াত যদি খাস হয় তাহলে সে নিজেই স্পষ্ট। তার ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। যদি খবারে আহাদ দিয়ে তার ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে যেন এ আয়াতকে মানসুখ করা হল। আর খবারে আহাদ দিয়ে কুরআনের আয়াত মানসুখ হয়না।[১০৬]

মূলনীতির ব্যাখ্যা :

১০৬. নুরুল আনওয়ার, খাস অধ্যায় ।

কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, তোমরা রুকু কর এবং সিজদা কর! *(হজ্জ ৭৭)*। এখানে রুকু ও সিজদার কথা স্পষ্ট ভাবে এসেছে। রুকুর শাব্দিক অর্থ মাথা নুয়ানো ও সিজদার শাব্দিক অর্থ কপালকে মাটিতে ঠেকানো। এ আয়াতের অর্থ স্পষ্ট হওয়ায় কোন হাদীছ দিয়ে এ আয়াতের কোনরূপ ব্যাখ্যা করা চলবেনা। যেমন কোন হাদীছ পেশ করে বলা যাবে না যে রুকু-সিজদা ধীরস্থির ভাবে করতে হবে। শুধু মাত্র মাথা নোয়ালে রুকু হয়ে যাবে ও কপাল মাটিতে ঠেকালে সিজদা হয়ে যাবে। এই মূলনীতির আলোকে রাসূল (ছাঃ)-এর বহু হাদীছকে অচল করে দেয়া হয়েছে।

যে হাদীছকে অচল করা হয়েছে :

ছহীহ বুখারীর ৭৫৭ নং হাদীছ। ভালভাবে রুকু সিজদা না করার জন্য একজন ব্যক্তিকে রাসূল (ছাঃ) তিনবার ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। অবশেষে সঠিক না হওয়ায় আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তাকে ছালাত আদায় শিখিয়ে দিয়েছেন। ইমাম বুখারী এই হাদীছের উপর অধ্যায় রচনা করেছেন 'যার রুকু সম্পূর্ণ হয়নি তার ছালাত পূণরায় আদায় করার নির্দেশ'। এ হাদীছ থেকে মুহাদ্দিছীনে কেরাম দলীল গ্রহণ করেছেন ছালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য ধীরস্থিরভাবে আদায় করা যরুরী। যাকে আরবীতে তা'দীলে আরকান বলা হয়। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর এই ছহীহ হাদীছকে এ মূলনীতি দিয়ে অকেজো করে দেয়া হয়েছে।

অনুরুপভাবে এই মূলনীতির কারণে বহু হাদীছকে অমান্য করা হয়েছে। যেমন- নিয়ত করা, অজুতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, পূর্ণ মাথা মাসেহ করা, ইত্যাদী সহ অগণিত হাদীছকে অচল করে দেয়া হয়েছে এ মূলনীতি দিয়ে।

মূলনীতির খণ্ডন :

(ক) স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন, সিজদা ও রুকু সঠিক হওয়ার জন্য কম সে কম তিনবার তাসবীহ পড়ার মত সময় অপেক্ষা করতে হবে। ইমাম আবু হানীফার এ ক্বওল তার ছাত্র আবু মুতী আল-বালখী নকল করেছেন।[১০৭]

(খ) এ মূলনীতির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে আরবী ভাষায় সিজদার অর্থ কপাল মাটিতে রাখা। অথচ স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন, কপাল না ঠেকালেও ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। শুধু যদি নাক মাটিতে ঠেকানো হয় তাতেই ছালাত হয়ে যাবে।[১০৮] তাহলে শাব্দিক অর্থের উপর ভিত্তি করে যে মূলনীতি পাক-

১০৭. নুরুল-ইজাহ ১২৫।
১০৮. আল- বাহরুর রায়েক ১/২৯৩।

ভারতের আলেমগণ তৈরি করলেন তা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) দ্বারা ভুল প্রমাণিত হল।

(গ) ইবনুল আবেদীন (রহঃ) সহ হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত আলেমগণ শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী এ সিজদা শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্তারোপ করেছেন, কপাল মাটিতে এবং নিতম্ব আসমানের দিকে এই রকম ঠাট্টামূলক সিজদা যেন না হয়।[১০৯] কেননা যেহেতু শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী শুধু কপাল ঠেকালেই ছালাত হয়ে যাবে সেহেতু কেউ ঠাট্টা করে এভাবেও ছালাত আদায় করতে পারে। এই জন্য তারা এ শর্তারোপ করেছেন। নিজেদের পক্ষ থেকে এ শর্ত লাগালে তা কি কুরআনের খাস আয়াতের ব্যাখ্যা হল না? রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ দিয়ে ব্যাখ্যা ও শর্তারোপ করলে যদি তা গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে মানুষের বিবেক প্রসূত শর্ত কিভাবে গ্রহণযোগ্য হয়? আশা করি ওলামায়ে কেরাম ভেবে দেখবেন।

মূলনীতি-২

কুরআনের আয়াত যদি ব্যাপক অর্থবোধক হয় তাহলে তা অকাট্য। কোন খবারে আহাদ দিয়ে তাকে খাস করা যাবে না।[১১০] এ মূলনীতির মাধ্যমেও বহু হাদীছকে অকেজো করে দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন মাজীদে বলেন, فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ‘কুরআন থেকে যা তোমাদের সহজ হয় তা তোমরা তিলাওয়াত কর’ *(মুযাম্মিল ২০)*।

এ আয়াতে ক্বিরাআত তথা পড়া শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। কুরআনের যেকোন আয়াত পড়লেই হল। সুতরাং হাদীছ দ্বারা তাকে খাস করা যাবেনা। এ মূলনীতি দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম একটি ছহীহ হাদীছকে অচল করে দেয়া হয়েছে, তিনি বলেন, لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ‘যে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার কোন ছালাত নেই’।[১১১] এ হাদীছ প্রমাণ করে কুরআনের এ আয়াতে কিরাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হচ্ছে সূরা ফাতিহা। সূরা ফাতিহা পড়তেই হবে তারপর অন্য কোন সূরা।

শাব্দিক অর্থ নয় শারঈ অর্থ মানদন্ড :

উপরে আলোচিত মূলনীতিগুলোতে কুরআনের আয়াতের শাব্দিক অর্থকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আয়াত যদি আম-খাস হয় তাহলে শাব্দিক অর্থই চুড়ান্ত। হাদীছ থেকে তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। প্রথমত আমি স্পষ্ট করতে চাই ইসলামী শরীয়তে শাব্দিক অর্থের চেয়ে শারঈ অর্থের গুরুত্ব বেশী। ছালাত শব্দের শাব্দিক

১০৯. হাশিয়া, ইবনুল আবেদীন ১/৩৩০।
১১০. নুরুল আনওয়ার, আম অধ্যায়।
১১১. ছহীহুল বুখারী হা/৭৫৬।

অর্থ দু'আ করা কিন্তু শুধু দু'আ করলেই ছালাত হয়ে যাবে না। বরং শরীয়াতের দেখানো পথ অনুযায়ী দিনে ৫ বার ছালাত আদায় করলেই তবে আদায় হবে। তেমনি হজ্জ শব্দের শাব্দিক অর্থ নিয়ত করা কিন্তু শরীয়তে হ্জ্জ তাওয়াফ, সাফা-মারওয়া সায়ী, আরাফায় অবস্থানসহ এক বিরাট কর্মযজ্ঞের নাম। এই বিষয়গুলো যদি কেউ কুরআন থেকে পড়ে শুধু শাব্দিক অর্থ করে এবং সেগুলোর ব্যাখ্যায় হাদীছের প্রয়োজন নেই মনে করে তাহলে তা হাদীছ অস্বীকার করা ও শরীয়তকে অচল করার নামান্তর।

এ মূলনীতি তৈরিকারীগণও শাব্দিক অর্থ দিয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অজুর ক্ষেত্রে দুই হাত, মুখমন্ডল ও দুই পা গোসলের এবং মাথা মাসাহের নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু আরবী ভাষায় গোসল ও মাসাহ করার শাব্দিক অর্থ স্পষ্ট সুতরাং হাদীছ থেকে এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। যদি হাদীছ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে তাদের মূলনীতি অনুযায়ী এ আয়াত মানসুখ হয়ে যাবে। এই জন্য তাদের ফৎওয়া হচ্ছে, অজুতে নিয়ত না করলেও, ধারাবাহিকতা বজায় না রাখলেও অজু হয়ে যাবে। কেননা অজুতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে শুধু মাত্র গোসল ও মাসেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে স্বয়ং হানাফী মাযহাবের বড় বড় ইমামগণ গোসলের শাব্দিক অর্থ নির্ধারণে ইখতিলাফ করেছেন। শুধু তাই নয় নুরুল আনওয়ারের লেখক স্বয়ং মোল্লা জিউন দুই জায়গায় গোসলের দুই রকম অর্থ করেছেন। নুরুল আনওয়ারে লিখেছেন পানি প্রবাহিত হওয়াকে গোসল বলে। অন্যদিকে তার লিখিত 'আত-তাফসির আল-আহমাদিয়্যা'তে লিখেছেন, ভিজা হাত অঙ্গের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়াকে গোসল বলে।[১১২]

অন্যদিকে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেছেন, অজুর অঙ্গ থেকে কম সে কম এক ফোটা হলেও পানি ঝরে পড়তে হবে নাহলে তা গোসল হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন শুধু পানি প্রবাহিত হলেই অজু হয়ে যাবে যদিও ঝরে না পড়ে।[১১৩] হানাফী মাযহাবের ব্যারিস্টার খ্যাত ইমাম ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন, শুধু পানি প্রবাহিত হওয়া নয় হাত দিয়ে ডলতেও হবে।[১১৪] তাদের এ ইখতিলাফ থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ গোসলের অর্থ আরবী ভাষায় স্পষ্ট নয়। সুতরাং মোল্লা জিউনের এ মন্তব্য যে গোসলের অর্থ স্পষ্ট হওয়ায় হাদীছ দ্বারা নিয়ত ও ধারাবাহিকতার শর্তারোপ করা যাবে না একটি ভ্রান্ত দাবী।

১১২. আত-তাফসীর আল আল-আহমাদিয়্যা ৩৪৪।
১১৩. ফাতহুল ক্বাদীর ১/১৫।
১১৪. প্রাগুক্ত।

দ্বিতীয়ত ভাষাগত শাব্দিক অর্থ দিয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা একটি ভ্রান্ত মূলনীতি। কুরআনের ব্যাখ্যা আল্লাহর রাসূল করবেন। অজুর আয়াতে গোসল ও মাসাহ মানে কি? কিভাবে অজু করতে হয় তা স্বয়ং মুহাম্মাদ (ছাঃ) দেখিয়ে দিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে স্পষ্ট হাদীছ থাকতে উদ্ভট উসূল তৈরী করে সেই হাদীছকে অস্বীকার করা রাসূল (ছাঃ)-এর অপমান বৈ কিছুই নয়।

যিয়াদা আলান-নাস :

কুরআনের আয়াত হচ্ছে মুতাওয়াতির যা 'ইলমে ইয়াক্বিনী' বা নিশ্চিত বিশ্বাসের ফায়দা দেয় যাকে 'কাতইউস সুবুত' বা অকাট্যভাবে প্রমাণিত বলা হয়। আর খবারে আহাদ 'যন' বা ধারণার ফায়দা দেয়। সুতরাং ধারণা দিয়ে নিশ্চিত জ্ঞানের ব্যাখ্যা করা যাবে না। যদি ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে তা 'যিয়াদা আলান-নাস' বা কুরআনে অতিরিক্ত করা হবে। যার কারণে কুরআনের এ আয়াত মানসুখ বলে গণ্য হবে। এ উসূলের ভিত্তিতে শত শত হাদীছকে অকেজো করে দেয়া হয়েছে। এটি একটি উদ্ভট উসূল এবং রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের শানে বেয়াদবী। দুনিয়ার কোন আয়াতে মহান আল্লাহ বা কোন হাদীছে তাঁর রাসূল বলেননি যে, আমার পক্ষ থেকে যদি কোন হাদীছ যা কুরআনের উপর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করে তা গ্রহণ করিওনা; বরং শত শত দলীল রয়েছে যা প্রমাণ করে হাদীছ কুরআনের ব্যাখ্যা। আর সত্যি বলতে কি, এটি একটি অচল মূলনীতি। যারা এই মূলনীতি তৈরি করেছে তারাও সবক্ষেত্রে এই মূলনীতি অনুসরণ করেনা।

'উত্তরাধীকারীদের জন্য কোন অসীয়ত নেই'।[১১৫] রাসূলের এই হাদীছ খবারে আহাদ। এই ফৎওয়ার উপর সকল মাযহাবের ইজমা আছে। তারাও এ খবারে আহাদ দিয়ে এ ফৎওয়াই দিয়েছেন এবং সূরা বাকারার ১৮০ নং আয়াতকে মানসূখ বলেছেন। সূরা নিসার ২৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ১৪ নারীকে বিবাহ করা হারাম করেছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর খবারে আহাদ হাদীছ দ্বারা তার উপর অতিরিক্ত করে স্ত্রীর খালা ও ফুফুকেও হারাম করা হয়েছে। এই রকম শত উদাহরণ আছে। মূলতঃ এ মূলনীতি একটি নিকৃষ্ট মূলনীতি। হাদীছ শাস্ত্রকে অচল ও অকেজো করে দেয়ার জন্য এই একটি মূলনীতিই যথেষ্ট।

১১৫. ইবনু মাজাহ হা/২৭১৪।

Contents

মূলনীতি-৩

গাইরে ফকিহ রাবির বর্ণিত রেওয়ায়েত যদি বিবেকের বিরোধী হয় তাহলে সেই রেওয়ায়েতকে গ্রহণ করা হবে না। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ), আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত।[১১৬] নাঊযুবিল্লাহ !! আস্তাগফিরুল্লাহ!!

যে হাদীছকে অচল করা হয়েছে :

কোন বিক্রেতা মানুষ যাতে ধোঁকা খায় এই জন্য কয়েকদিন যাবত গরুর ওলানে দুধ আটকিয়ে রেখে গরুকে বাজারে নিয়ে যায়। মোটা ওলান দেখে ক্রেতার মনে হবে গরু হয়তো প্রতিদিন অনেক দুধ দেয়। ক্রেতা ধোঁকা খেয়ে গরুটি ক্রয় করে বাড়ীতে নিয়ে যায়। কয়েকদিন যাওয়ার পর সে বুঝতে পারে সে ধোকা খেয়েছে। এখন সে গরুটি আবার ফেরত দিতে চায়। সমস্যা হচ্ছে ক্রেতা যে কয়দিন দুধ খেল তার বদলে বিক্রেতাকে কি দিবে? ক্বিয়াস অনুযায়ী সে যে পরিমাণ দুধ খেয়েছে সেই পরিমাণ দুধ বা সমমূল্য পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে হাদীছে এসেছে ক্রেতাকে এক-ছা খেজুর দিতে হবে।[১১৭] হাদীছটা ক্বিয়াস বিরোধী। ১০ কেজি দুধ খেয়ে থাকলেও এক ছা। ১ কেজি খেয়ে থাকলেও এক ছা। কেমন যেন বিবেকে খটকা লাগে। হয়তোবা হাদীছটি আবু হানীফা (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছেনি এই জন্য তিনি ক্বিয়াস অনুযায়ী ফৎওয়া দেন। পরবর্তীতে হাদীছ পাওয়া গেলে অনেকেই এ হাদীছকে অস্বীকার করার জন্য বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে গাইর ফক্বীহ বলে তাঁর হাদীছ ক্বিয়াস বিরোধী হলে গ্রহণ না করা। যেমনটা হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত উসূলের বই উসূলুছ-ছারাখসীতে বলা হয়েছে।[১১৮] এই মূলনীতির ফলে প্রবল প্রতিবাদ ও বিরোধীতার মুখোমুখী হতে হয় হানাফী আলেমগণকে। বর্তমানে এ উসূল তারা আর গ্রহণ করেন না বলে বলে থাকেন। উল্লেখ্য যে, আবু হানীফা (রহঃ) ছহীহ তো অনেক দূরের যঈফ হাদীছকেও তিনি ক্বিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতেন। এই জন্যই যঈফ হাদীছের ভিত্তিতে হাসির কারণে ছালাত ভাঙ্গবে মর্মে তিনি ফৎওয়া দিয়েছেন যদিও তা ক্বিয়াস বিরোধী। রাহিমাহুল্লাহ রাহমাতান ওয়াসিয়া ।

সংশয় নিরসন :

সত্যি যুক্তির আলোকে আমাদের মনে হতে পারে ক্রেতা যত কেজি দুধ খেয়েছে হয় ততখানি দুধ দিবে অথবা তার দাম দিবে। তাহলে রাসূল (ছাঃ) কেন এমন যুক্তিবিরোধী ফায়ছালা দিলেন। আমরা আগেই বলেছি যুক্তি বিরোধী মনে হলে

১১৬. নুরুল আনওয়ার, সুন্নাত অধ্যায়।
১১৭. ছহীহুল বুখারী হা/২১৪৮।
১১৮. উসূলুছ-ছারাখসী ১/৩৪১।

সেটা আমাদের বিবেকের দুর্বলতা। সত্যি বলতে কি, এ মাসালায় যুক্তির আলোকে ফায়ছালা করা হলে বিরাট বিশৃংখলার আশংকা আছে। কেননা ক্রেতা তার বাড়ীতে কয় কেজি দুধ খেয়েছে তা বিক্রেতা জানে না। ক্রেতা টাকা বাঁচানোর জন্য দুধের পরিমাণ কমিয়ে মিথ্যা বলতে পারে। বিক্রেতার সন্দেহ হলে সে বেশী দাবী করে বসতে পারে। তখন উভয়ের মাঝে গন্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ গন্ডগোল ক্বিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ) সর্বাবস্থায় ক্রেতাকে গরুর সাথে এক ছা খেজুর ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

মূলনীতি-৪

উমুমে বালওয়ার ক্ষেত্রে 'খবারে আহাদ' দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবেনা । উমুমে বালওয়া অর্থ যেই বিষয়টির ভুক্তভোগি আম জনসাধারণ। এই রকম কোন বিষয়ে খবারে আহাদ গ্রহণীয় হবে না।

যে হাদীছকে অচল করা হয়েছে :

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন পানি দুই কুল্লা হয়, তখন তাতে অপবিত্রতা পড়লেও তা অপবিত্র হয়না'।[১১৯]

আল্লামা তাক্বী উসমানি (হাঃ) তার দারসে তিরমিযীতে তিরমিযীর এই হাদীছের জবাবে আলোচিত মূলনীতিটি পেশ করেছেন। যেহেতু প্রতিটি মুসলিমকে পবিত্রতা অর্জন করতে হয় সেহেতু পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কিত মাসালা বা পানি সম্পর্কিত মাসালাগুলো উমুমে বালওয়া। সুতরাং এই ক্ষেত্রে খবারে আহাদ হাদীছ দিয়ে দলিল গ্রহণ করা যাবে না । অথচ দুঃখ জনক হলেও সত্য যে, যারা এ মূলনীতি দিয়ে হাদীছকে রাদ্দ করেছেন তাদের নিকটে ১০/১০ হাত বিশিষ্ট পুকুরের পানিতে অপবিত্রতা পড়লে তা অপবিত্র হয়না। তাদের এই ফৎওয়ার পিছনে ছহীহ দূরে থাক যঈফ-জাল হাদীছও নেই। আফসোসের বিষয় হচ্ছে বিবেক প্রসূত ফৎওয়া যদি উমুমে বালওয়াতে চলে রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ কেন চলবে না? মহান আল্লাহ আমাদের হিফাযাত করুন!

ছহীহ হাদীছ কি কুরআনের বিরোধী হতে পারে?

উপরের মূলনীতিগুলোতে মনোযোগ দিলে দেখা যাবে সর্বদা হাদীছকে কুরআনের বিরোধী মনে করা হচ্ছে। মূলত এই বিশ্বাসটিই সকল ভ্রান্তির জড়। তাদের অলিখিত মূলনীতি হচ্ছে হাদীছকে কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ না

১১৯. তিরমিযী হা/৬৭।

করে সর্বদা কুরআনের বিপরীত হিসেবে গ্রহণ করা। যে সমস্ত হাদীছগুলো কুরআনের অনুকূলে হবে সেগুলো গ্রহণ করা হবে যেগুলো কুরআনের বিপরীত হবে সেগুলো গ্রহণ করা হবে না। এই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য একটি জাল হাদীছও তৈরি করা হয়

مَا جَاءَكُمْ عَنِّي فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَهُ فَأَنَا قُلْتُهُ، وَمَا خَالَفَهُ فَلَمْ أَقُلْهُ.

তথা 'তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে যা পৌঁছে তা তোমরা কুরআনের সাথে তুলনা কর! যদি তা কুরআনের অনুকূল হয় তাহলে আমি বলেছি আর যদি কুরআনের অনুকূল না হয় তাহলে আমি বলিনি'।

তাহক্বীক্ব : এ হাদীছকে প্রায় সকল মুহাদ্দিছীনে কেরাম জাল বলেছেন। যিনদিক্বদের তৈরি করা হাদীছ।[১২০] এই রকম আরো কিছু হাদীছ বর্ণনা করা হয় যার সবগুলোই যঈফ; বরং রাসূল (ছাঃ) থেকে আমরা পুর্বেই দেখেছি তিনি বলেছেন আমি কুরআন ও তার মত একটি জিনিস নিয়ে এসেছি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ছহীহ হাদীছ কি কুরআনের বিরোধী হতে পারে? আমরা আগেই দেখেছি মুহাদ্দিছগণ একটি হাদীছের সনদ ও মূল টেক্সট উভয়ই যাচাই-বাছাই করার পর হাদীছকে ছহীহ বলেন। সুতরাং কোন ছহীহ হাদীছ পবিত্র কুরআনের বিরোধী হতে পারেনা বরং তা কুরআনের ব্যাখ্যা। যেমন-

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন,

لَيْسَ يُخَالِفُ الْحَدِيثُ الْقُرْآنَ وَلَكِنَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَيِّنُ مَعْنَى مَا أَرَادَ خَاصًّا وَعَامًّا وَنَاسِخًا وَمَنْسُوخًا.

'হাদীছ কুরআনের বিরোধী হয় না; বরং রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ কুরআনের খাস, আম ও নাসেখ-মানসুখের বিষয়ে বর্ণনা করে'।[১২১]

ইমাম ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন,

لا سبيل إلى وجود خبر صحيح مخالف لما في القرآن أصلا وكل خبر شريعة

'এটা মোটেই সম্ভব নয় যে, কোন ছহীহ হাদীছ কুরআনের বিরোধী হয়। প্রত্যেক হাদীছ শরীয়াত'।[১২২]

১২০. মাআলিমুস সুনান ৪/২৯৯।
১২১. কিতাবুল উম্ম ৭/৩৬০।
১২২. আল-ইহকাম ফি উসূলিল আহকাম ২/৮১।

এইজন্য যুগে যুগে মুহাদ্দিছীনে কেরাম বলেছেন, السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْقُرْآنِ وَلَيْسَ الْقُرْآنُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنَّةِ 'সুন্নাত কুরআনের উপর ফায়ছালা করবে কুরআন সুন্নাতের উপর নয়'।[১২৩]

সুন্নাহ নির্ধারণ করে দিবে কুরআনের কোন্ আয়াতের কি ব্যাখ্যা? কোন্ আয়াত দ্বারা কি উদ্দেশ্য? আয়াত থেকে কী কী মাসালা বের হবে? কুরআনের সকল বিষয়ে সুন্নাত ফায়ছালা করবে। সুতরাং হাদীছকে কুরআনের বিপরীতে পেশ করে হাদীছকে অচল করে দেয়া ইসলামের শত্রুদের শিখানো পন্থা।

সব শর্ত কি শুধু হাদীছের জন্য :

আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যারা এই জাতীয় বিভিন্ন ধরণের অভিযোগ হাদীছের উপর উত্থাপন করে তারা নিজেদের ক্ষেত্রে কখনোই সে অভিযোগ গুলো উত্থাপন করে না। একজন রাবীর বর্ণিত হাদীছ ছহীহ হওয়ার পরেও যন্নী বলে ফৎওয়া দেয়া হলেও নিজের ইমামের কথা ঠিকই গ্রহণ করা হয়। অথচ ইমাম মাত্র একজন। ইমামের মন্তব্য মুতাওয়াতির সূত্রে পৌঁছলে গ্রহণ করা হবে আর খবারে আহাদ সূত্রে পৌঁছলে গ্রহণ করা হবে না এ কথা কখনোই বলা হয় না। এটা তো অনেক দূরের কথা মাযহাবের ইমামের মন্তব্য সঠিক সনদসহ আছে কিনা তাও যাচাই-বাছাই করেও দেখার প্রয়োজন মনে করা হয় না। অথচ সনদ ছহীহ হওয়ার পরেও হাদীছ না মানার কত বাহানা!! কত শর্ত!! রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ কুরআনের ব্যাখ্যা করতে পারবে না কিন্তু ইমাম ঠিকই কুরআনের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ ক্বিয়াস বিরোধী হলে গ্রহণ করা হবে না আর ইমামের বক্তব্য হাদীছ বিরোধী হলেও গ্রহণ করা হবে। ইমামের শাগরেদগণ ফক্বীহ কিনা তা কখনো শর্তারোপ করা হবে না অথচ রাসুলের ছাহাবী ফকীহ কিনা তা ঠিকই শর্তারোপ করা হবে। কি সেলুকাস পৃথিবী ! কি বিচিত্র দুনিয়া! প্রাচ্যবিদরা এরিস্টটল, প্লেটো, সক্রেটিস এদের হাযার বছর আগের কথা সনদ ছাড়াই বিশ্বাস করবে কিন্তু রাসুলের হাদীছের ছহীহ সনদ থাকলেও হাযার রকম অভিযোগ উত্থাপন করবে। মযবূত রাবী কি ভুল করতে পারে না এই অভিযোগ তুলে ছহীহ হাদীছকে বরবাদ করতে চায় কিন্তু নিজে যে ভুলতে করতে পারে এ কথা কখনোই বলে না। তাওরাত ও ইঞ্জীলে লাখ বিকৃতি হওয়ার পরেও তা আল্লাহর বাণী হিসেবে মানতে প্রাচ্যবিদদের কোন কষ্ট হয় না অথচ দুনিয়ার সবচেয়ে অবিকৃত ও সংরক্ষিত ধর্ম ইসলামের বাণীতে সন্দেহ সৃষ্টি করতে খুব সিদ্ধহস্ত। তাওরাত ও ইঞ্জীলের যেখানে কোন সনদ নেই তবুও কোন অভিযোগ নেই অথচ হাদীছের ছহীহ সনদ থাকতেও কত রকমের অভিযোগ। দুনিয়ার

১২৩. সুনানে দারেমী হা/৬০৭।

সকল লেখক সকল বিজ্ঞানী সকল মনীষী সকল ইমাম সকলের কথা সনদ ছাড়াই গ্রহণ করা হবে, বিশ্বাস করা হবে কিন্তু আমার রাসূল (ছাঃ)-এর কথা ছহীহ সনদে প্রমাণিত হলেও তার কথা হিসেবে না মানতে বাহানা ও যুক্তির শেষ থাকে না। আর অবশ্যই তাদের অন্তরে বক্রতা আছে।

এই মূলনীতি গুলো ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) থেকে প্রমাণিত নয় :

ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) তার লিখিত 'আল ইনসাফ' বইয়ে এই মূলনীতিগুলোর প্রচন্ড বিরোধিতা করেন। তিনি দাবী করেন এই মূলনীতি গুলো পরবর্তীদের তৈরী। তিনি বলেন, وَأَنه لَا تصح بهَا رِوَايَة عَن أبي حنيفَة وصاحبيه 'আর এই মূলনীতিগুলো আবু হানীফা (রহঃ) ও তাঁর দুই ছাত্রের পক্ষ থেকে বর্ণনা করা সঠিক নয়'।[১২৪]

সত্যি বলতে কি, সালাফে-ছালেহীনের হাদীছের প্রতি ভালবাসা দেখলে বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয় যে তারা এই ধরণের ভ্রান্ত মূলনীতি তৈরী করতে পারেন। বরং এটাই সত্য যে, মাযহাবের নামে গোঁড়া কিছু অন্ধ মুকাল্লিদের বিকৃত মস্তিষ্কের সৃষ্টি এই মূলনীতি গুলো। উল্লেখ্য যে আমরা এখানে নমুনা হিসেবে কিছু মূলনীতি পেশ করেছি মাত্র। এই জাতীয় আরো অনেক মূলনীতি রয়েছে যার মাধ্যমে হাদীছকে অচল করা হয়।

তা'বীল বা দূরর্বতী ব্যাখ্যার বেড়াজালে হাদীছ :

তা'বীল করা দুই প্রকার । প্রয়োজনে তা'বীল করা এবং নিজের স্বার্থের জন্য তা'বীল করা। নিজের স্বার্থের জন্য তা'বীল করা একটি ঘৃণিত কাজ। ইয়াহূদীদের স্বভাব। মহান আল্লাহ্ ইয়াহূদীদেরকে শনিবারের দিন মাছ শিকার করতে নিষেধ করেছিলেন। তারা কৌশল করে শুক্রবারের দিন মাছ আটকে রাখত আর রবিবারের দিন শিকার করত। এটাকেই বলা হয় তা'বীল। এটা চরম ঘৃণিত কাজ। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি একদল মানুষও কুরআন এবং হাদীছের সাথে এই ঘৃণিত কাজটি করে। তার কিছু উদাহরণ নীচে পেশ করা হল-

উদাহরণ-১

যেমন কেউ আল্লাহর ক্বসম করে বলল আমি এই বছর এই বাড়ীতে থকব না। রাগের মাথায় কসম করার পর নিজের ভুল বুঝতে পারে। এখন কি করবে। মুফতী তাকে বললেন, আপনি ওই বাড়ীতে থাকেন। তবে এক বছর হতে যখন

১২৪. আল-ইনসাফ ফি আসবাবিল ইখতিলা ৯০।

কিছু দিন বাকী থাকবে তখন আর থাকবেন না। তাহলে কসমও ভাঙ্গল না। কাফফারাও দেওয়া লাগল না। আপনার থাকাও হয়ে গেল। এই জাতীয় তা'বীল হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট তা'বীল। ইসলামী বিধানের সাথে খেলনা স্বরুপ। এই জাতীয় তা'বীলকে 'হিলা' বলা হয়। হাদীছকে অমান্য করার সর্বশেষ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার হয় এই তা'বীল।

নিজের স্বর্থের জন্য তা'বীল করার আরেকটি প্রকার হচ্ছে, দূরবর্তী ব্যাখ্যা। যারা উপরের কোন পদ্ধতির মাধ্যেমেই হাদীছকে অস্বীকার করতে পারেনা তারা এই তাবীলের আশ্রয় নেয়। যেমন, রাসুল (ছাঃ) সমুদ্রের পানি সম্পর্কে বলেছেন, هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ 'সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং মৃত প্রাণী হালাল।[১২৫]

এই হাদীছ দিয়ে মুহাদ্দিছীনে কেরাম সমুদ্রের নির্দিষ্ট কিছু প্রাণী ব্যতিত সব প্রাণীকে হালাল বলেছেন। কিন্তু একদল আলেম সমুদ্রের শুধু মাছ ব্যতিত সব কিছুকে হারাম বলে থাকেন। এই হাদীছের বাহ্যিক অর্থ তাদের বিরোধী হওয়ায় তারা এই হাদীছের দূরবর্তী ব্যাখ্যা করে থাকেন। এই হাদীছের তা'বীলে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ) তার 'আল-আরফুশ-শাযি' বইয়ে শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবান্দি (রহঃ) থেকে নকল করেছেন, শায়খুল হিন্দ (রহঃ) বলেন, 'এখানে আরবী শব্দ হিল বা হালাল অর্থ পবিত্র অর্থাৎ সমুদ্রের মৃত প্রাণী পবিত্র'।[১২৬]

সমুদ্রের পানি যেমন পবিত্র তেমনি তাতে যে প্রানি মারা যায় তাও পবিত্র। সুতরাং সমুদ্রের পানিতে বিভিন্ন ধরণের প্রানি মারা যাওয়াতে সমুদ্রের পানি অপবিত্র হয়না। তাতে অজু করা জায়েয। দুনিয়ার কোন আলেম এই ব্যাখ্যা তার পূর্বে করেন নি। সবাই এখানে 'হিল' থেকে হালাল অর্থই গ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক অর্থ তাই প্রমাণ করে। এমনকি দারুল উলুম দেওবান্দের আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ শায়খ হাবিবুর রহমান আজমি (হাফিঃ) আমাদের ক্লাসে এই তা'বীলকে অপছন্দ করেছেন।

উদহারণ-২

عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وُضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا أَبُو قَتَادَةَ الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ.

১২৫. আবু দাউদ হা/৮৩; তিরমিযী হা/৬৯।
১২৬. আল-আরফুশ-শাযি' ১/১০৪।

কাবশা বিনতে কা'ব ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত তিনি আবু ক্বাতাদার ছেলের স্ত্রী ছিলেন। একদিন আবু ক্বাতাদা তার বাড়িতে আসলেন। তিনি তার জন্য ওজুর পানি ঢালছিলেন এমতবস্থায় হটাৎ একটা বিড়াল আসল এবং অজুর পাত্র থেকে পানি পান করা শুরু করল। আবু ক্বাতাদা বিড়ালের জন্য পাত্রটি আরো নীচে করে দিল। কাবশা বলেন, আবু ক্বাতাদা আমাকে দেখলেন যে, আমি তার দিকে আশ্চর্য হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। তখন তিনি বললেন, হে আমার ভাতিজি! তুমি কি আশ্চর্য হচ্ছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, নিশ্চয়! রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়! বিড়ালে কোনরূপ অপবিত্রতা নেই । নিশ্চয় বিড়াল তোমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়ানো প্রাণী।[১২৭]

এই হাদীছ থেকে ইস্তিদলাল করে মুহাদ্দিছগণ বলেছেন যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র। কিন্তু একদল আলেমের ফৎওয়া হচ্ছে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র । যেহেতু এই হাদীছের বাহ্যিক অর্থ তাদের বিরোধী তাই তারা এই হাদীছের তা'বীল করে থাকে। তারা বলে এই হাদীছে পবিত্র দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিড়াল যদি আমাদের বিছানায় উঠে, গায়ের সাথে লাগে তাহলে আমাদের বিছানা, কাপড়-চোপড় অপবিত্র হবে না।

এই ভাবে তারা হাদীছের অর্থকে এমনভাবে ঘুরিয়ে দেয় যাতে হাদীছের আসল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায়। হাদীছের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছাড়া এই ভাবে অনর্থক তা'বীল করা ছাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

عن البراء بن عازب قال سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوءِ من لُحومِ الإبلِ فقال تَوضَّؤوا منها.

বারা ইবনে আযিব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলকে জিজ্ঞাসা করা হল উটের গোশতের জন্য অজু সর্ম্পকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা অজু কর'।[১২৮]

অজু শব্দের শাব্দিক অর্থ হাত-মুখ ধোয়া। ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ থেকে উট খেয়ে হাত-মুখ ধোয়া বুঝেননি। বরং হাদীছের বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী নিয়ম মাফিক অযু করা বুঝেছেন। তারা তাই করেছেন। সুতরাং অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয়ভাবে হাদীছের বাহ্যিক অর্থকে ঘুরানো একটি ঘৃণিত স্বভাব। যা হাদীছ অস্বীকার করার শেষ চোরাগলি।

১২৭. আবু দাঊদ হা/৭৫।
১২৮. আবু দাঊদ হা/১৮৪।

হাদীছ ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য
হাদীছ অস্বীকারের নতুন চোরাগলি

হাদীস ও সুন্নাতের মাধ্যে পার্থক্য করার নামে হাদীছ অস্বীকার করার নতুন চোরাগলি উন্মুক্ত করা হয়েছে। 'ইমামে আজম আওর ইলমে হাদীছ' নামের একটি বইয়ে আমার জানামতে সর্বপ্রথম এই ধারণা পেশ করা হয়। অতঃপর দারুল উলুম দেওবান্দের শায়খুল হাদীছ আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মুফতি সাঈদ আহমাদ পালানপুরি (হাফিঃ) তার লিখিত 'ইলমি খুতুবাত' বইয়ের একটা বিরাট অংশ জুড়ে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া তার লিখিত বুখারির উর্দু ব্যাখ্যা 'তুহফাতুল কারীর' গ্রন্থের শুরুতেও এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অতঃপর বাংলাদেশের কিছু ভাই সেই তত্ত্ব জোরেশোরে প্রচার করেন। উল্লেখ্য যে স্বয়ং দারুল উলুম দেওবান্দের ইবনু হাযার খ্যাত আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মুফতী হাবিবুর রহমান আজমী (হাফিঃ) এ থিউরীর প্রতিবাদে একটি বই লিখেছেন। বইয়ের নাম 'হুজ্জিয়াতে হাদীছ আওর উস পার আমাল কি সুরাতে'। এ বইয়ে তিনি অত্যন্ত কড়া ভাষায় এ থিউরীর প্রতিবাদ করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ে প্রথমে তাদের থিউরী দলীল সহ পেশ করা হল-

এ আলোচনা করতে গিয়ে মানতিক্বের পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। মানতিক্বের একটি পরিভাষা হচ্ছে 'আম খাস মিন ওজহ'। যে দুই বস্তুর মাঝে পরস্পরে দু'টি বিষয়ে অমিল এবং একটি বিষয়ে মিল থাকবে তাদের পরস্পরের সম্পর্ককে 'আম খাস মিন ওজহ' বলা হবে। যেমন সাদা রং ও প্রাণীর মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে 'আম খাস মিন ওজহ'। কেননা দুনিয়াতে অনেক জিনিস আছে যেগুলো সাদা কিন্তু প্রাণী নয় যেমন সাদা পাথর। তেমনি দুনিয়াতে অনেক জিনিস আছে যেগুলো প্রাণী কিন্তু সাদা নয় যেমন কাক। তেমনি দুনিয়াতে অনেক জিনিস আছে যেগুলো প্রাণীও এবং সাদাও যেমন বক। সুতরাং সাদা ও প্রাণীর মধ্যে 'আম খাস মিন ওজহ'-এর সম্পর্ক। তেমনি হাদীছ ও সুন্নাত। অনেক হাদীছ আছে যেগুলো হাদীছ কিন্তু সুন্নাত নয়। তেমনি অনেক সুন্নাত আছে যেগুলো সুন্নাত কিন্তু হাদীছ নয়। আবার অনেক হাদীছ আছে যেগুলো হাদীছও এবং সুন্নাতও। দলীল হচ্ছে-

খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত সুন্নাত কিন্তু হাদীছ নয়। যেমন খোলাফায়ে রাশেদীনের যামানায় জমা হওয়া কুরআনকে মেনে নেয়া, শুক্রবারের দুই আযান ইত্যাদি খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত যদিও তা হাদীছে নেই। তেমনি দাঁড়িয়ে পেশাব করার হাদীছ আছে কিন্তু তা সুন্নাত নয়। প্রশ্ন হচ্ছে কিসের উপর ভিত্তি করে আমরা বুঝব যে এই হাদীছটা হাদীছ কিন্তু সুন্নাত নয় বা হাদীছও এবং সুন্নাতও। তাদের লেখা পড়লে যেটা বুঝা যায় তা হচ্ছে, যে বিষয়গুলোর উপর

রাসূল (ছাঃ) নিয়মিত আমল করেছেন বা পরবর্তীতে উম্মতের আমল থেকেছে সেগুলো সুন্নাত বাকীগুলো হাদীছ। নীচে বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হল-

(ক) কোন বিষয় সুন্নাত হওয়ার জন্য নিয়মিত আমল শর্ত নয়। রাসূল (ছাঃ) তার জীবনে শুধু একবার হজ্জ করেছেন। তারপরেও যার সাধ্য রয়েছে তার জন্য হজ্জ করা ফরয। তেমনি হজ্জের মাসায়েলের মধ্যে যেগুলো সুন্নাত সেগুলোও শুধু মাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর একবারের আমলের উপর ভিত্তি করে সুন্নাত। শুধু তাই নয় রাসূল (ছাঃ) যে কাজ কোনদিন করেননি তাও সুন্নাত হতে পারে। যেমন তিনি আশুরায়ে মুহাররামের সিয়াম শুধুমাত্র ১০ তারিখে একদিন রেখেছেন কিন্তু তার কথার উপর ভিত্তি করে সকল ওলামায়ে কেরাম আশুরার সিয়াম দুইদিন সুন্নাত ফৎওয়া দিয়েছেন। এই রকম শত উদাহরণ পেশ করা যাবে যেগুলো সুন্নাত কিন্তু তার উপর রাসূল (ছাঃ)-এর আমল নেই। থাকলেও নিয়মিত নয়।

(খ) তেমনিভাবে উম্মতের আমল থাকলে হাদীছের উপর আমল করতে হবে অন্যথায় নয় এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা; বরং হাদীছ পাওয়া গেলে আমল ছেড়ে দিতে হবে এটাই সালাফে ছালেহীনের নীতি। যা বিস্তারিত দলীল সহ পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ। আমল না থাকার কারণে যদি হাদীছ পরিত্যাগ করা হয় তাহলে শরীয়ত অকেজো হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত তো অনেক দূরের কথা বর্তমানে ফরযের উপরও মানুষ আমল করে না। সবাই হারাম কাজে লিপ্ত। সুতরাং উম্মতের আমল বা কোন দেশের আমলকে মানদন্ড করা হাদীছকে অস্বীকার করার চোরাগলি বৈ কিছু নয়।

(গ) খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল সুন্নাত কিন্তু হাদীছ নয় এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। কেননা স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) তার হাদীছে খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের উপর আমলের নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেন,
فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ
তথা 'তোমাদের উপর যরুরী যে, তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাত মেনে চলবে। তাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর! মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধর'![১২৯]

সুতরাং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের উপর আমল করা মূলতঃ হাদীছের উপর আমল করা।

১২৯. আবু দাউদ হা/ ৪৬০৭।

(ঘ) উপরের হাদীছে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) সুন্নাত আঁকড়ে ধরতে বলছেন। এই কথার অর্থ কী? শুধু কি সেই আমলগুলো করতে হবে যেগুলো সুন্নাত? আর যেগুলো ফরয বা হারাম সেগুলোর কি হবে? এই হাদীছে তো রাসূল (ছাঃ) বলেননি তোমরা ফরযের অনুসরণ কর! সুতরাং এই হাদীছে সুন্নাত মানে ফিক্বহী সুন্নাত নয়। সুন্নাত হচ্ছে প্রত্যেক যা আমরা রাসূল থেকে পেয়েছি চাহে তা তার কথা হোক বা কাজ হোক বা মৌনসম্মতি হোক।

(ঙ) হাদীছ ও সুন্নাতের মধ্যে আমলের শর্তারোপ করে যে পার্থক্য করা হয়েছে এ বিষয়ে কোন মন্তব্য অতীত যুগের আলেমগণের কিতাবে পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়; বর্তমানের আরব আলেমগণও এ বিষয়ে কিছু জানেন না। এই ফিতনা সম্পূর্ণটাই ভারতে সৃষ্ট।

(চ) যারা এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তারা নিজেরাই মূলতঃ সংশয়ে রয়েছে। যেমন পালানপুরী উস্তাদজী স্বয়ং তার বই 'তুহফাতুল কারী'-তে লিখেছেন 'যখন আমরা মুনকিরীনে হাদীছদের বিরুদ্ধে কথা বলব তখন আমরা হুজ্জিয়াতে হাদীছের পক্ষে কথা বলব এবং যখন আহলে হাদীছদের বিরুদ্ধে কথা বলব তখন আমরা হুজ্জিয়াতে সুন্নাতের পক্ষ কথা বলব'।[১৩০] এই মন্তব্যের কারণে তার দাবী ও দলীল আরো অস্পষ্ট হয়ে গেল।

সংশয় নিরসণ :

হাদীছ ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্যকারীদের সংশয় সৃষ্টি হয়েছে মূলতঃ ওই সমস্ত হাদীছ থেকে যেগুলোর উপর রাসূল একবার হলেও আমল করেছেন কিন্তু আমরা সেটাকে সুন্নাত মনে করি না। যেমন দাঁড়িয়ে পেশাব করার হাদীছ। এই সংশয় দূরীকরণে বলতে চাই-

(ক) হাদীছের শাব্দিক অর্থ, কথা। সুন্নাতের শাব্দিক অর্থ, পথ ও পন্থা। হাদীছ এবং সুন্নাত দুটাই শাব্দিক অর্থে পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 'মহান আল্লাহ তোমাদেরকে বর্ণনা করতে চান এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথে পরিচালনা করতে চান' *(নিসা ২৬)*।

তেমনি রাসূল (ছাঃ) বলেন,
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ.

১৩০. তুহফাতুল ক্বারী ৫০-৬০।

'অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের পদাংক অনুসরণ করবে'।[১৩১]
উপরের আয়াত ও হাদীছে সুন্নাতকে শাব্দিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

(খ) পারিভাষিক অর্থে হাদীছ ও সুন্নাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুন্নাত এবং হাদীছ পারিভাষিকভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে বলা হয়। হানাফী উসূলে ফিক্বহের বই গুলোতে যেমন নুরুল আনোয়ার, উসূলুশ-শাশী, হুসসামীসহ বিভিন্ন বইয়ে সুন্নাত অধ্যায়ের অধীনে সুন্নাতের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে সেটাই হাদীছের সংজ্ঞা। যেমন বিখ্যাত হানাফী গ্রন্থ 'মুছাল্লামু-সুবুত' গ্রন্থকার সুন্নাতের সংজ্ঞায় বলেন,

كل ما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم غير القران.
'প্রত্যেক যা রাসূল (ছাঃ) থেকে এসেছে কুরআন ব্যতীত তাই সুন্নাত।[১৩২]
মুহাদ্দিছগণ হুবহু এই সংজ্ঞায় দিয়েছেন হাদীছের ক্ষেত্রে।[১৩৩]

যুগ যুগ ধরে ওলামায়ে কেরাম সুন্নাত ও হাদীছকে পারিভাষিকভাবে একই অর্থ হিসেবে ব্যবহার করে এসেছেন। যেমন ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন,
تطلق السنة علي على الأحاديث المروية عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'সুন্নাত শব্দটি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের জন্য ব্যবহৃত হয়'।[১৩৪] একই মন্তব্য করেছেন বিখ্যাত হানাফী আলেম আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহঃ) তার যফরুল আমানীতে (ظفر الأماني), আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহঃ) তার 'তারিখুস সুন্নাহ ওয়া উলুমিল হাদীছ' (تاريخ السنة وعلوم الحديث) বইয়ে, আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) তার 'বেহেশতী জিওর' বইয়ে।[১৩৫]

সত্যি বলতে কি, সালাফে ছালেহীন সুন্নাত ও হাদীছের মধ্যে পারিভাষিক অর্থের দিক দিয়ে পার্থক্য করেছেন মর্মে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। সুতরাং পারিভাষিক অর্থের ক্ষেত্রে সুন্নাত ও হাদীছ তাদের নিকট সমার্থবোধক, এতে কোন সন্দেহ নেই। যা উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট।

(গ) শরীয়তের ভিত্তি দু'টি বিষয়ের উপর। প্রথমটি হচ্ছে কুরআন। কুরআনের বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন কিতাবুল্লাহ, কালামুল্লাহ, ফুরক্বান ইত্যাদী। তেমনি শরীয়তের ২য় ভিত্তি হাদীছেরও বিভিন্ন নাম রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে

১৩১. ছহীহ বুখারী হা/৩৪৫৬।
১৩২. মুসাল্লামুছ ছুবুত ২/৬৬।
১৩৩. ফাতহুল বারী ১/১৯৩; তাওজীহুন-নাযর ১/৩৭।
১৩৪. তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ৩/১৫৬।
১৩৫. যফরুল আমানী ২৪, তারীখুস সুন্নাহ ৯, বেহেশতী জিওর ৩৮০।

সুন্নাত, আছার ও খাবার। সালাফে ছালেহীনের যুগ থেকে নিয়ে অদ্যাবিধি হাদীছের জন্য ব্যবহৃত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে সুন্নাত। ইমাম তিরমিযী, আবু দাঊদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ (রহঃ) তাঁদের বইয়ের নাম রেখেছেন 'সুনান' যা সুন্নাতের বহুবচন। অথচ তাদের বইয়ে যেমন হারাম আছে তেমন ফরয আছে। যেমন মদ খাওয়া হারামের হাদীছ আছে তেমনি ছালাত আদায় করা ফরযের হাদীছ আছে। তার মানে আমরা কি বলব মদ খাওয়া সুন্নাত? নাঊযুবিল্লাহ! মদ খাওয়া হারাম কিন্তু যেখান থেকে আমরা এ হারামের দলীল নিচ্ছি সেটাকে হাদীছ বলা হয় এবং সুন্নাতও বলা হয়। খাবারও বলা হয়। সেটাকে আছারও বলা হয়। সালাফগণ যুগ যুগ ধরে সুন্নাতকে হাদীছ অর্থে ব্যবহার করেছেন। আর আমরাও তাই বুঝি 'সুনানে আবি দাঊদ' মানে হাদীছের সম্ভার। যা লেখকের ভাষায় সুন্নাতের সম্ভার।

(ঘ) হাদীছ এবং সুন্নাত আমাদের মাঝে ওই ভাবে ব্যবহৃত হয় না যেইভাবে সালাফগণ ব্যবহার করেছেন। যেমন আমরা কখনো বলি না এই সুন্নাত ছহীহ আমরা বলি হাদীছ ছহীহ। অথচ আবি দাঊদ তিরমিযীসহ চারটি গ্রন্থকে 'সুনানে আরবাআ' বলা হয়। এই বইগুলোর প্রতিটি হাদীছ সুন্নাহ। আবার এই সুন্নাহ গুলোকেই সনদগত যঈফ ও ছহীহ বলা হয়। কিন্তু আমরা সুন্নাত বলতে বুঝি ফিক্বহী ওয়াজিব, ফরযের মত সুন্নাত। হাদীছের অপর নাম যে সুন্নাত এটা খুব সংখ্যক মানুষই জানে। মানুষের এই অজ্ঞতাকে হাতিয়ার বানিয়ে তারা খুব সুন্দর করে বলে এটা হাদীছ সুন্নাত নয়। অথচ পারিভাষিক অর্থে যেটা হাদীছ সেটাই সুন্নাত।

(ঙ) একটা আইনের ধারা আরেকটি সেই ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত রায়। দু'টি আলাদা। একটা কুরআন আরেকটা কুরআনের আয়াত অনুযায়ী প্রদত্ত হুকুম। কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً. তথা 'আর আপনি রাতের একাংশে তাহাজ্জুদের নফল ছালাত আদায় করুন' (*ইসরা* ৭৯)।

এ আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-কে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ আমাদের জন্য তাহাজ্জুদের ছালাত ফরয নয়।

তেমনি মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا 'যখন তোমরা ইহরাম থেকে হালাল হও তখন তোমরা শিকার কর'। এ আয়াতে মহান আল্লাহ শিকারের জন্য নির্দেশ সূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আমাদের উপর শিকার করা ফরয নয় বরং জায়েয।

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে কুরআন এবং কুরআনের আয়াত থেকে নির্গত হুকুমের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। অনুরূপ হাদীছ ও হাদীছ থেকে নির্গত হুকুমের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ অনুযায়ী ফিতরা আদায় করা

ফরয এবং দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয। সুতরাং আইনের ধারা হিসাবে যেমন আমরা কুরআন মানতে বাধ্য তেমনি আইনের ধারা হিসাবে হাদীছ মানতে বাধ্য। কিন্তু সেই ধারা থেকে নির্গত হুকুম কি হবে সেটা আলাদা বিষয়। দুইটাকে গুলিয়ে ফেলার জন্যই মূলতঃ এ সংশয় তৈরি হয়েছে।

খোলাফায়ের রাশেদীনের আমল এবং রাসূলের আমল পরস্পর বিরোধী হয় তাহলে আমরা কি করব?

খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের আমল সেখান থেকে শুরু হবে যেখান থেকে রাসুলের হাদীছ শেষ হবে। মুসলিমের জীবন সমস্যার কোন সমাধান যদি হাদীছে না পাওয়া যায় তাহলে আমরা সেই সমস্যার সমাধান খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে নিব এবং তাঁদের সেই সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরব। যেমন-

- কুরআনকে জমা করা এবং তাকে শুধু কুরাইশি স্টাইলের উপর রাখা।
- ইসলামের কোন বিধানকে একত্রে কোন গোত্র বা সম্প্রদায় অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা যেমন আবু বকর (রাঃ) করেছিলেন।
- মুসলিমের দু'টি গ্রুপে যুদ্ধ হলে। বিজিত বাহিনী পরজিত বাহিনী থেকে গণিমত গ্রহন করবে না। যেমনটা সিফফিনের যুদ্ধে আলী (রাঃ) করেছিলেন।
- নেতৃত্ব নির্বাচনে খোলাফায়ে রাশেদীনের পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে কোন সমাধান আছে সেসব ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতেরই অনুসরণ করতে হবে। আমাদের উপর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণকেই ফরয করা হয়েছে।

عن ابن عباس قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عُروة بن الزبَير نَهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس ما يقول عُرَيّة قال يقول نَهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس أُراهم سَيَهْلِكُون أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেক বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) হজ্জে তামাত্তু করেছেন। তখন উরওয়া ইবনে যুবায়ের বলেন, আবু বকর ও ওমর (রাঃ) হজ্জে তামাত্তু থেকে নিষেধ করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি তোমাদেরকে

ধ্বংসের মধ্যে দেখছি আমি বলছি আল্লাহর রাসূল করেছেন আর তোমরা বলছ আবু বকর ও ওমর নিষেধ করেছেন’।[১৩৬]

হাদীছ মানতেই হবে

কুরআন এবং হাদীছ ইসলামের প্লাটফরম। আমরা কুরআন এবং হাদীছ মানতে বাধ্য। কুরআন বিষয়ে কারো তেমন ইখতিলাফ নেই। ইসলামের শত্রুদের যত হামলা তার নিরীহ শিকার হাদীছে রাসূল। নীচে হাদীছ মানতে আমরা যে বাধ্য তার দলীল পেশ করলাম-

হাদীছ অহী :

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ‘এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। তাতো অহীই যা প্রত্যাদেশ করা হয়’ *(নাজম ৩-৪)।*

তিনি আরো বলেন,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ - لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ - ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ.

‘যদি সে আমাদের নামে বানিয়ে কিছু বলত, তাহলে ডানহাত দিয়ে তাকে পাকড়াও করতাম অতঃপর তার শাহরগ (গ্রীবা) কেটে দিতাম’ *(হা-ক্বা ৪৪-৪৬)।*

এ আয়াতে মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাসূল (ছাঃ) নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে কিছু বলেন না। যা কিছু তাঁর মুখ দিয়ে নির্গত হয় তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। তথা আমাদের সামনে থাকা হাদীছের ভাণ্ডার মূলতঃ কুরআনের মতই মহান আল্লাহ প্রদত্ত দিক নির্দেশনা।

আমল কবুল হওয়ার শর্ত হাদীছের অনুসরণ

কোন আমল কবুল হওয়ার জন্য দু’টি শর্ত। ইখলাস ও ইত্তিবায়ে সুন্নাত। যত ভাল আমলই হোক না কেন যদি সুন্নাতের অনুসারে না হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ‘যে ব্যক্তি কোন আমল করল যার উপর আমার কোন নির্দেশ নেই তা পরিত্যাজ্য’।[১৩৭]

হাদীছের স্তর কি কুরআনের পরে?

আমাদের মাঝে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে হাদীছের স্তর কুরআনের পরে। কিন্তু বাস্তবতা তা নয়। বরং হাদীছ যদি ছহীহ হয় তাহলে দলীল হিসেবে উভয়টিই সম পর্যায়ের। কেননা-

১৩৬. মুসনাদে আহমাদ হা/৩১২১।
১৩৭. ছহীহুল মুসলিম হা/৩২৪৩।

(ক) উভয়টিই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী।

(খ) হাদীছ কুরআনের ব্যাখ্যা। আর আইনের ব্যাখ্যা আইনের মতই হয়।

(গ) যদি আমরা বলি হাদীছের স্তর কুরআনের পরে তাহলে কুরআনের যে সমস্ত অগণিত আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের কথা বলা হয়েছে সেগুলোর স্তরকেও নীচু করা হবে। যা অপমানজনক।

(ঘ) যেহেতু আমরা প্রমাণ করেছি ছহীহ হাদীছ কুরআনের বিরোধী হতে পারে না। সেহেতু একটাকে আরেকটার চেয়ে কম মূল্যায়নের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকেন।

আাদর্শ মানে কি?

মডেল মানে কী? আমরা কী বুঝি? মডেলের বাংলা অর্থ আদর্শ। সরাসরি বলতে গেলে আমাদের নায়ক। আমাদের হিরো। আমাদের তরুণ সমাজ আজ খেলোয়াড়দেরকে পর্দার নায়ক-নায়িকাদেরকে নিজেদের জীবনের মডেল বানিয়ে নিয়েছে। মেসি দশ নাম্বারের যে জার্সি পরে তারাও সেটা পরে। পর্দার নায়কেরা যে স্টাইলে চুল কাটে আমাদের তরুণ সমাজ সেই স্টাইলের চুল কাটে। আমাদের বনেরা 'বোঝেনা সে বোঝেনা' সিরিয়ালে পাখি যেমন পোশাক পরে তেমন পোশাক ক্রয় করার জন্য আত্মহত্যা করে। তারা রঙ্গীন পর্দার মানুষগুলোকে নিজেদের জীবনের মডেল মনে করে। অথচ আমাদেরকে এর চাইতেও শতগুণ বেশী রাসূলকে আমাদের জীবনের মডেল মনে করতে হবে। আমাদের তরুণদের নায়ক হবে মুহাম্মাদ (ছাঃ), খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, তারিক ইবনে যিয়াদ, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)। তারা যা করেছেন আমরা তাই করব। পাগলের মত। অন্ধের মত। কেননা আমরা তাদের ভালবাসি। প্রয়োজনে জীবন দিব। আমরা হাদীছ পাওয়ার পর কোন সময় জিজ্ঞেস করব না, কেন তিনি এটা করলেন? এটা করা কি যরুরী? বরং বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিব। তেমনি আমাদের মা-বোনদের মডেল হবে আয়েশা, খাদীজা, ফাতিমা (রাঃ)। তারা পাখির জন্য নয় আয়েশার মত পোশাক পরার জন্য জীবন দিবে। এর নাম জীবনের মডেল। লাইফের আদর্শ। এই হিসেবেই মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ.

'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করে, পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের জন্য রাসূল (ছাঃ)এর জীবনীতে এক সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে' *(আহযাব ২১)*।

শুধু তাই নয় ওই ‘পাখি’ আর ‘মেসি’ যেন আমাদের রাসূলকে অন্ধের মত অনুসরণ করে আমরা সেই চেষ্টা করব। আমরা দাওয়াত নিয়ে মানুষের ঘরে ঘরে যাব।

ইত্তিবা মানে কি?

ইত্তিবা শব্দটি আরবী ‘তাবিয়া’ থেকে নির্গত। ইত্তিবা-এর শাব্দিক অর্থ পদাংক অনুসরণ করা। মনে করেন বৃষ্টি ভেজা অন্ধকার রাতে কোন কর্দমাক্ত জমির মধ্যে দিয়ে আপনারা যাচ্ছেন। সামনের জনের হাতে হারিকেন আছে। পিছনের সবাই তার অনুসরণ করছে। এখানে অনুসরণ মানে কী? ২য় জন ঠিক ওই জায়গায় পা ফেলছে যেখানে প্রথম জন পা ফেলেছে। একটু এদিক সেদিক হলে আশংকা আছে পিছলে পড়ার। ভয় আছে কোন বিষাক্ত পোকা-মাকড়ের উপর পা পড়ে যাওয়ার। কিন্তু যে সামনে আছে তার হাতে হারিকেন থাকায় সে সব কিছু দেখতে পাচ্ছে। আমরা অন্ধের মত শুধু তার পা ফেলা জায়গায় পা ফেলছি। এর নাম পদাংক অনুসরণ। একে বলে ইত্তিবা। ঠিক এই কাজটিই আমাদেরকে করতে বলেছেন মহান আল্লাহ। যতক্ষণ না আমরা হুবহু রাসূল (ছাঃ)-কে অনুসরণ করব ততক্ষণ ইত্তিবার অর্থ বাস্তবায়ন হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

‘বলুন! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর! আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দিবেন। আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু’ *(আলে-ইমরান ৩১)*।

তিনি আরো বলেন,

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً.

‘অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে নিবে’ *(নিসা ৬৫)*।

তিনি আরো বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا.

‘আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়সালা দিলে কোন মু‘মিন পুরুষ ও মু‘মিন নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কোন সিদ্ধান্তের এখতিয়ার থাকে না;

আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হল' *(আল-আহযাব ৩৬)*।

তিনি আরো বলেন

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

'আর রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর' *(হাশর ৭)*।

তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً.

'হে মু'মিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য কর! আর তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের আনুগত্য কর; অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে ফিরিয়ে দাও; যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখ, এটাই কল্যাণকর এবং শ্রেষ্ঠতর সমাধান' *(নিসা ৫৯)*।

বিজাতীয় অনুসরণ তরুণ সমাজের হীনম্মন্যতা

একটা ছেলে প্রতিদিন টিভি দেখার জন্য পাশের বাসায় যায়। টিভিতে যাদেরকে দেখে তাদের মত হওয়ার চেষ্টা করে। তাদেরকে নিজের অজান্তেই হিরো মনে করে। নিজের পোশাক-আশাক সবকিছু পাল্টিয়ে তাদের মত হতে চায়। একদিন ছেলেটার মা তাকে ডেকে বলল, বাবা! অন্যকে টিভিতে দেখে নিজের সময় নষ্ট কর না! এমন কাজ কর! যেন একদিন তারা তোমাকে টিভিতে দেখে। তারা যেন তোমার মত হতে চায়! প্রথমদিকে ছেলেটা হীনম্মন্যতায় ভূগত তাই অন্যদেরকে নিজের চেয়ে বড় মনে করত। আজ থেকে তার নিজেকে সকলের চেয়ে বড় মনে হতে লাগল। ছেলেটা এখন প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী। নিজের আদর্শ নিয়ে সে শুধু সন্তুষ্ট নয় গর্বিত।

নদীতে পানাও থাকে নৌকাও থাকে। পানা খড়-কাঠির মত স্রোত যেদিকে যায় সেদিকে যায়। কিন্তু নৌকা স্রোতের সাথে লড়াই করে নিজ গতিতে চলে। আমাদের তরুণ সমাজ আজ নদীতে ভাসা সেই খড়-কুটার মত। ভ্যালুলেস।

আত্মবিশ্বাসহীন। হীনম্মন্য। যুগের তালে তালে তাদের মন-মানসিকতা, পোশাক-আশাক চেঞ্জ হয়ে যায়। তাদের ভিতরে আত্ম মর্যাদাবোধ নেই। আত্ম বিশ্বাসের শক্তি নেই। বিজাতীয়দের নষ্ট আদর্শ ও পঁচা সংস্কৃতি তাদের কাছে ভাল লাগে। নিজেদেরটা ছোট মনে হয়। যারা এই ভাবে স্রোতের গতিতে ভাসে তাদের দ্বারা জীবনে কোন বড় কাজ সম্ভব নয়। বড় কাজের জন্য চাই আত্মবিশ্বাস। চাই 'না' বলতে পারার ক্ষমতা। যা দেখব তাই গ্রহণ করব না। যা শুনব তাই বিশ্বাস করব না। তারা চাচ্ছে আমরা যেন তাদের মত হই তাদেরটা ক্রয় করি। তাদের দেখানো পথে চলি। আমাদের তরুণ সমাজ যখন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করবে 'না'। আমরা তোমাদের কথায় গোলামের মত উঠ-বস করব না। আমাদের স্বাধীন সত্ত্বা আছে। আমাদের স্বাধীন চিন্তা শক্তি আছে। আমাদের নিজস্ব আদর্শ আছে, নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। তখনই বিপ্লব আসবে। এরই নাম আত্ম বিশ্বাস। এটার নাম আত্ম মর্যাদাবোধ। এই জন্য মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

'আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য কর এবং তোমরা পরস্পর ঝগড়া কর না, তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি শেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন *(আনফাল ৪৬)*।

রাসূলকে অমান্যকারীদের জন্য শুধু আফসোস

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا.

'আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে অবশ্যই তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তাতে তারা চিরকাল থাকবে' *(জিন ২৩)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.

'যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে; আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' *(নিসা ১৪)*।

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا.

'যেদিন তাদের চেহারাগুলো আগুনে উলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে, হায়! যদি আমরা আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করতাম! তারা আরও বলবে হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা আমাদের নেতা ও

গুরুদের কথা মেনেছিলাম, ফলে তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব প্রদান করুন এবং তাদেরকে মহা অভিশাপে অভিশপ্ত করুন' *(আহযাব ৬৬-৬৮)*।

হায়! আফসোস! যদি আমি রাসূল (ছাঃ)-এর পথ ধরতাম

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلا أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولا.

'আর সেদিন অপরাধী নিজের দু'হাত কামড়িয়ে বলবে, হায় আফসোস! যদি আমি রাসূল (ছাঃ)-এর পথ ধরতাম। হায়! আমার দুর্ভোগ! আমার আফসোস! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। অবশ্যই সে আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ বাণী কুরআন পৌঁছার পর; আর শয়তান হল মানুষের জন্যে মহাপ্রতারক' *(ফুরক্বান ২৭-৩০)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরনে জান্নাত লাভ

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

'আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, আর এটাই মহাসফলতা' *(নিসা ১৩)*।

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا.

'আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত। আর যে ব্যক্তি পিছনে ফিরে যাবে তিনি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন' *(ফাত্হ ১৭)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণেই সফলতা

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

'আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করে ও আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করে চলে, তারাই সফলকাম' *(নূর ৫২)*।

وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'আর যদি তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য কর তাহলে তোমাদের আমলসমূহ হতে কিছুই হ্রাস করা হবে না; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(হুজুরাত ১৪)*।

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের আমলসমূহ সংশোধন করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন; আর যে আল্লাহর ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করবে অবশ্যই সে মহাসাফল্য অর্জন করবে' *(আহযাব ৭১)*।

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا.

'আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করবে এবং সৎকর্ম করবে আমি তাকে দুবার প্রতিদান দেব আর আমি তার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি সম্মানজনক জীবিকা' *(আহযাব ৩১)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারীদের জন্য সুসংবাদ

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

'আর যে কেউ আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করবে, সে থাকবে ঐসব লোকদের সাথে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, (তারা হল) নবীগণ, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলদের সাথে; আর সাথী হিসেবে তারা হবে কতই না উত্তম'! *(নিসা ৬৯)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণে ছাহাবীগণের নজীর বিহীন দৃষ্টান্ত

পূর্বে আমরা ইত্তিবার যে অর্থ জেনেছি ছাহাবায়ে কেরাম সেই ইত্তিবার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন। তারা পাগলের মত রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতেন।

দৃষ্টান্ত-১

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي شَجَرَةً بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَيَقِيلُ تَحْتَهَا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 'তিনি একদা মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি একটি গাছের নিকটে আসলেন এবং তার নীচে বিশ্রাম করলেন। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল এখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।[১৩৮]

তাহক্বীক্ব : সকল রাবী মযবূত।

দৃষ্টান্ত-২

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضى الله عنه يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُبْزًا وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ .

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা এক দর্জি রাসূল (ছাঃ)-কে তার তৈরি খাবারের জন্য দাওয়াত করল। আনাস (রাঃ) বলেন, আমিও রাসূলের সাথে খাবার খেতে গেলাম। রাসূলের নিকট রুটি ও লাউ-গোশতের তরকারী পেশ করা হল। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখলাম তিনি পাত্রের চারদিক থেকে লাউ খুঁজে নিচ্ছেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমি লাউকে ভালবাসি।[১৩৯]

দৃষ্টান্ত-৩

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود ولا يعرف الحكمة من ذلك يقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.

ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকট আসলেন এবং বললেন, আমি জানি তুমি কোন ক্ষতি করতে পারনা কোন উপকারও করতে পারনা। আমি যদি আল্লাহর রাসূলকে তোমাকে চুমা দিতে না দেখতাম আমিও চুমা দিতাম না।[১৪০]

দৃষ্টান্ত-৪

১৩৮. মুসনাদে বাযযার হা/৫৯০৯।
১৩৯. ছহীহুল বুখারী হা/২০৯২।
১৪০. ছহীহুল বুখারী হা/১৫৯৭।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وَقَالَ إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) স্বর্ণের আংটি গ্রহণ করলে সকল লোক স্বর্ণের আংটি গ্রহণ করল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি স্বর্ণের আংটি গ্রহণ করেছিলাম আর আংটিটি খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন, আমি কখনো স্বর্ণের আংটি পরিধান করব না। সাথে সাথে সকলেই স্বর্ণের আংটি খুলে দিলেন।[১৪১]

তাহক্বীক্ব : সনদ ছহীহ।

দৃষ্টান্ত-৫

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم، ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرٌ أو قال أَذًى.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা রাসূল (ছাঃ) তার ছাহাবীগণের মাঝে ছিলেন হটাৎ তিনি তার পায়ের জুতা খুলে বাম পাশে রাখলেন। যখন ছাহাবীগণ এটা দেখলেন তারাও তাদের পায়ের জুতা খুলে দিলেন। যখন রাসূল (ছাঃ) তার ছালাত শেষ করলেন তখন বললেন, তোমরা কেন তোমাদের জুতা খুললে? তারা জবাবে বললেন, আমরা আপনাকে জুতা খুলতে দেখেছি এই জন্য'।[১৪২]

তাহক্বীক্ব : সনদ ছহীহ।

দৃষ্টান্ত-৬

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ اجْلِسُوا فَسَمِعَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ.

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'একদা রাসূল (ছাঃ) যখন খুৎবা দেয়ার জন্য মিম্বারে উঠলেন, কিছু দাঁড়িয়ে থাকা ছাহাবীকে উদ্দেশ্য করে তিনি

১৪১. মুসনাদে আহমাদ হা/৫২৪৯।
১৪২. সুনানে আবি দাঊদ হা/৬৫০।

বললেন, তোমরা বস! রাসূল (ছাঃ)-এর এই নির্দেশ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) শুনতে পেলেন তিনি মসজিদের দরজাতেই সাথে সাথে বসে যান। রাসূল (ছাঃ) বিষয়টি দেখে বললেন, ভিতরে আস! হে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ'।[১৪৩]

তাহক্বীক্ব : সনদ ছহীহ।

দৃষ্টান্ত-৭

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلَمَّا انْتَهَى قَالَ مَا مِنْ غَدَاءٍ أَوْ عَشَاءٍ شَكَّ طَلْحَةُ قَالَ فَأَخْرَجُوا فَلْقًا مِنْ خُبْزٍ قَالَ أَمَا مِنْ أُدْمٍ قَالُوا لَا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ قَالَ أَدْنِيهِ (2) فَإِنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الْأُدْمُ هُوَ قَالَ جَابِرٌ مَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقَالَ طَلْحَةُ مَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা তার হাত ধরে তার বাড়ীর দিকে নিয়ে গেলেন। যখন তিনি পৌঁছে গেলেন তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, খাবার কিছু আছে? (এটা রাতের খাবার না দুপুরের খাবার তা নিয়ে রাবী তালহার সন্দেহ আছে) তখন বাড়ীর লোকেরা এক ফালি রুটি দিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন সবজি আছে কি? তারা বলল, টক রস ব্যতীত কিছুই নেই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সেটাই দাও! নিশ্চয় টক রস কতইনা উত্তম সবজি! জাবের (রাঃ) বলেন, আমি সেই দিন থেকে টক রসকে ভালবাসতে শুরু করেছি। তালহা বলেন, আমি যেদিন থেকে জাবেরের মুখে এই ঘটনা শুনেছি সেদিন থেকে আমিও টক রসকে ভালবাসতে শুরু করেছি।[১৪৪]

তাহক্বীক্ব : সনদ ছহীহ।

দৃষ্টান্ত-৮

রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণে ছাহাবীগণ যেমন অবিশ্বাস্য অবদান রেখেছেন মহিলা ছাহাবীগণও কোন অংশে কম ছিলেন না। জুলাইবিব নামের একজন ছাহাবী দেখতে কুৎসিত ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তার জন্য আনসারের একজন সুন্দরী মহিলার ঘরে প্রস্তাব পাঠান। মেয়ের পিতা আফসোস করেন, রাসূল (ছাঃ) আর কাওকে পেলেন না এই কুৎসিত ছেলের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। মাতা-পিতা সিদ্ধান্ত নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে না করার জন্য যাচ্ছেন, তখন ভিতর থেকে মেয়ে

১৪৩. সুনানে আবি দাউদ হা/১০৯১।
১৪৪. মুসনদে আহমাদ হা/১৫২৯৩।

বলে উঠল, প্রস্তাব কে পাঠিয়েছে? জবাবে পিতা বলেন, রাসূল (ছাঃ)। তখন মেয়ে বলল, أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَمْرَهُ আপনারা রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ ফিরিয়ে দিচ্ছেন? মেয়ের কথা শুনে পিতাও রাযি হয়ে যান।[১৪৫]

তাহক্বীক্ব : সনদ ছহীহ।

হাদীছের উপর আমলের ক্ষেত্রে ছাহাবীগণের আপোষহীন নীতি

উদাহরণ-১

রাসূল (ছাঃ) মারা যাওয়ার পূর্বে রোমের উদ্দেশ্যে উসামা ইবনে যায়েদের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। রাস্তার মাঝে থাকতেই রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর খবর তাদের নিকট পৌঁছে যায়। তারা মদীনায় ফিরে আসেন। দাফন-কাফন শেষে আবু বকর (রাঃ) খলিফা হন। খলিফা হওয়ার সাথে সাথেই তিনি পূণরায় উসামা ইবনে যায়েদের নেতৃত্বে সেই বাহিনীকে রোমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেন। তার এই নির্দেশে অধিকাংশ ছাহাবী আপত্তি জানান। বিশেষ করে ওমর (রাঃ)। কেননা ইতিমধ্যেই সমগ্র আরব জুড়ে অনেক মানুষ মুরতাদ হয়ে যায়, মিথ্যুক নবীর দাবীদারদের আর্বিভাব ঘটে। এই রকম করুণ পরিস্থিতিতে সর্বাগ্রে মদীনার হেফাযত করা জরুরী। যদি মদীনার মুজাহিদগণ বাহিরে চলে যায় তাহলে মদীনা কে হেফাযত করবে? ছাহাবীগণের এই জাতীয় মন্তব্য শুনে আবু বকর (রাঃ) ঘোষণা করেন,

لو أن الطير تخطفنا ولو أن السباع حول المدينة ولو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما رددت جيشًا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حللت لواء عقده.

যদি পাখিরা আমাদেরকে ঠুকরে খায়, যদি হিংস্র প্রাণীরা মদীনা ঘিরে নেয়, কুকুররা যদি উম্মাহাতুল মুমীনীনগণের পা ধরে টানা-হেঁচড়া শুরু করে, আমি আবু বকর সেই সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে নিব না যে সেনাবাহিনীকে আল্লাহর রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তার লাগানো পতাকা খুলব না।[১৪৬]

তাহক্বীক্ব : এ ঘটনার সনদ হাসান লি গাইরিহি।

উদাহরণ-২

১৪৫. মাওয়ারিদুয যামআন হা/২২৬৮।
১৪৬. আল-ইতিকাদ, বায়হাক্বী ১/৩৪৫।

আবু বকর (রাঃ) বলেন,

لستُ تاركاً شيئاً كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم يَعملُ به إلا عَمِلْتُ به إني أخشى إن تركتُ شيئاً من أمرِه أن أَزيغَ.

রাসূল (ছাঃ) কোন জিনিস করেছেন আমি তার বিন্দুমাত্র পরিত্যাগ করব না। আমি আশংকা করি যদি তার কোন আমল পরিত্যাগ করি তাহলে আমি পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাব।[১৪৭]

উদহারণ-৩

আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফাত আমলে যখন যাকাত অস্বীকারকারীগণ যাকাত দিতে অস্বীকার করল। তখন আবু বকর (রাঃ) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন,

وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.

আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি রশি গ্রহণ করতে বাধা প্রদান করে যা তারা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে দিচ্ছিল আমি সেই দড়ির জন্যও যুদ্ধ করব।[১৪৮]

আবু বকর (রাঃ) তার আড়াই বছরের খিলাফাত আমলে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ থেকে বিন্দুমাত্র পিছে হটেননি। তিনি হুবহু পুংখানুপুংখভাবে অন্ধের মত রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতেন। আর এটাই হল প্রকৃত ইত্তিবায়ে সুন্নাত।

উদাহরণ-৪

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنٌ لَهُ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتقولُ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে ছালাত আদায় করতে বাধা দিওনা! তখন তার ছেলে (বিলাল) বলল, নিশ্চয় আমি তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিব। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তার এই কথায় প্রচন্ড রাগান্বিত হয়ে গেলেন

১৪৭. ছহীহুল বুখারী ৩০৯৩।
১৪৮. ছহীহ বুখারী হা/১৪০০।

এবং বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ শুনাচ্ছি আর তুমি বলছ বাধা দিবে?[১৪৯]

তাহক্বীক্ব : সনদ ছহীহ।

উদাহরণ-৫

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا إِلَى جَنْبِهِ ابْنُ أَخٍ لَهُ فَخَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَإِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ. قَالَ فَعَادَ ابْنُ أَخِيهِ يَخْذِفُ فَقَالَ أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ثُمَّ تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا.

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা তিনি তার ভাতিজার সাথে বসে ছিলেন। তার ভাতিজা পাথর নিক্ষেপ করছিল (পাখি শিকারের জন্য) তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) তাকে নিষেধ করেন এবং বলেন রাসূল (ছাঃ) পাথর দ্বারা পাখি মারতে নিষেধ করেছেন। কেননা এর দ্বারা কিছু শিকার করা যায় না বরং এর ফলে দাত ভেংগে যায় চোখ নষ্ট হয়ে যায়। রাবী বলেন, এরপরেও সে আবার পাথর নিক্ষেপ করে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) বলেন আমি তোমাকে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ শুনাচ্ছি তারপরেও তুমি পাথর নিক্ষেপ করছ। আমি তোমার সাথে কখনো কথা বলবনা।[১৫০]

তাহক্বীক্ব : সনদ ছহীহ।

উদাহরণ-৬

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاوِيَةَ بِالْبَيْتِ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب فَقَالَ مُعَاوِيَةُ صَدَقْتَ.

ইবুন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি একদা তিনি মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর সাথে তাওয়াফ করছিলেন। মুয়াবিয়া (রাঃ) কাবা ঘরের সকল রুকুন স্পর্শ করছিলেন। তখন তাকে ইবনু আব্বাস বললেন, আপনি কেন এই দু'টি রুকুন স্পর্শ করছেন অথচ আল্লাহর রাসূল তেমনটি করেননি। তখন মুয়াবিয়া বললেন, কাবা ঘরের কোন অংশ পরিত্যাজ্য নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কুরআনের আয়াত

১৪৯. ইবনু মাজাহ হা/১৬।
১৫০. ইবনু মাজাহ হা/১৭।

তিলাওয়াত করেন, 'নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে'। তখন মুয়াবিয়া (রাঃ) বললেন, তুমি সত্য বলেছ।[১৫১]

তাহক্বীক্ব : সনদ ছহীহ।

উদাহরণ-৭

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَثَمَّ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ أَوْ قَالَ الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ إِنَّا نَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً، وَوَقَارًا وَمِنْهُ ضَعْفًا فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ وَأَعَادَ بُشَيْرٌ الْكَلَامَ قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَقَالَ أَلَا أُرَانِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ كُتُبِكَ.

আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমরা ইমরান ইবনে হুসাইনের দারসে ছিলাম। তিনি রাসূল থেকে হাদীছ শুনালেন, 'নিশ্চয় লজ্জা পুরোটাই কল্যাণ'। তখন বুশাইর বলে উঠলেন, আমরা কিছু কিতাবে পাই লজ্জায় গাম্ভীর্য ও স্থিরতা রয়েছে এবং দুর্বলতাও রয়েছে। তখন ইমরান (রাঃ) পূণরায় হাদীছ শুনালেন। বুশাইর পূণরায় তার কথা বলল। রাবী বলেন, ইমরান (রাঃ) রেগে গেলেন। তার দুই চক্ষু লাল হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ শুনাচ্ছি আর তুমি আমাকে তোমার কিতাব থেকে শুনাচ্ছ'।[১৫২]

তাহক্বীক্ব : সনদ ছহীহ।

হাদীছ পেয়ে মত পরিবর্তন

ওমর (রাঃ) তাঁর দশ বছরের খিলাফাত আমলে বহুবার হাদীছ পেয়ে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন। যেমন-

তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলির জন্য ১৫টি, তর্জনীর জন্য ১০টি, মধ্যমার জন্য ১০টি, অনামিকার জন্য ৯টি এবং কণিষ্ঠ আঙ্গুলির জন্য ৬টি উট রক্তমূল্য হিসেবে নির্ধারণ করেন। পরবর্তীতে তার নিকটে আমর হাযমের হাদীছ পৌঁছলে তিনি সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসেন।[১৫৩] এই ঘটনা পেশ করার পর ইমাম শাফেয়ী বলেন,

أن يُقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمضي عمل من الأئمة ودلالةٌ على أنه مضى أيضاً عملٌ من أحد من الأئمة ثم وَجَدَ خبراً عن النبي يخالف عملَه

১৫১. মুসনাদে আহমাদ হা/১৮৭৭।
১৫২. আবু দাউদ হা/৪৭৯৬।
১৫৩. রিসালা, ইমাম শাফেয়ী ৪২৩ পৃঃ।

لترك عمله لخبر رسول الله ودلالةٌ على أن حديث رسول الله يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده.

এই ঘটনা প্রমাণ বহন করে, খবারে আহাদ প্রমাণ হওয়া মাত্রই গ্রহণ করতে হবে। যদিও তার উপর কোন ইমামের আমল না থাকে এবং আরো প্রমাণ বহন করে, যদি কোন বিষয়ের উপর কোন ইমামের আমল থাকে আর তার বিপরীত রাসূল (ছাঃ)-এর আমল পাওয়া যায় তাহলে ইমামের আমল পরিত্যাগ করতে হবে। এ ঘটনা আরো প্রমাণ করে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ নিজেই দলীল যোগ্য। দলীলযোগ্য হওয়ার জন্য কারো আমলের মুখাপেক্ষী নয়।[১৫৪]

অগ্নিপূজকদের এলাকা জয় করার পর তাদের নিকটে জিযিয়া নিবেন কিনা তা নিয়ে ওমর (রাঃ) দ্বিধা-দ্বন্দে ভূগছিলেন। কেননা কুরআনে শুধু আহলে কিতাবের কথা বলা হয়েছে। তখন তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-এর হাদীছ শুনে অগ্নিপূজকদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১৫৫]

ওমর (রাঃ)-এর সিদ্ধান্ত ছিল রক্তমূল্য শুধু নিহতের উত্তরাধীকারীগণ পাবে। কোন স্ত্রী তার স্বামীর রক্তমূল্য পাবে না। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তার নিকট যাহহাক ইবনে সুফিয়ানের হাদীছ পৌঁছে তখন তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। এবং আশইয়াম যাবানীর স্ত্রীকে তার স্বামীর রক্তমূল্য প্রদান করেন।[১৫৬]

আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-এর সাথে ঘটা প্রসিদ্ধ ঘটনায় তিনি সালামের হাদীছের কারণে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।

ছাহাবীগণের মাঝে হাদীছ পাওয়ার ফলে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের এইরকম ঘটনা অগণিত।

হাদীছের সম্মানে ছালাফে সালেহীন

أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ يُحَدِّثَ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَلَبِسَ قَلَنْسُوَةَ وَمَشَطَ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أُوَقِّرُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৫৪. প্রাগুক্ত।
১৫৫. রিসালা, ইমাম শাফেয়ী ৪৩০ পৃঃ।
১৫৬. রিসালা, ইমাম শাফেয়ী ৪২৬ পৃঃ।

আবু ছালামা আল-খিযাঈ বলেন, ‘ইমাম মালেক (রহঃ) যখন হাদীছের দারসের জন্য বের হতেন তখন তিনি ছালাতের মত অযু করে নিতেন, সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করতেন, টুপি পরিধান করতেন এবং তার দাড়ি আঁচড়ে নিতেন। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে সম্মান করি’।[১৫৭]

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَهُوَ مَرِيضٌ يَقُولُ أَقْعِدُونِي فَإِنِّي أُعَظِّمُ أَنْ أُحَدِّثَ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ.

আবুযযিনাদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহঃ) অসুস্থ ছিলেন। তিনি বলেন, তোমরা আমাকে উঠিয়ে বসাও! আমার নিকটে এটা অনেক কঠিন যে আমি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ শুনাব এতবস্থায় আমি শুয়ে আছি।[১৫৮]

হাদীছের অনুসরণে ছালাফে সালেহীন

ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) উমারাদের নিকট লিখেছিলেন-

قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لا رأي لأحد مع سُنة سنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

‘রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের সাথে কারো ব্যক্তিগত মতামত গ্রহণযোগ্য নয়’।[১৫৯]

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ‘একদা বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইবনু আবি যিবের দরবারে একটি হাদীছ নিয়ে আলোচনা হয় তখন একজন প্রশ্নকারী ইবনু আবী যিবকে প্রশ্ন করে, তুমিও কি এ হাদীছ অনুযায়ী ফৎওয়া প্রদান কর? প্রশ্নকারী বর্ণনা করেন, তখন তিনি আমার বুকে জোরে একটা ধাক্কা মারলেন এবং অনেক জোরে চিৎকার করলেন, অতঃপর বললেন,

أحدِّثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به نعم آخذ به وذلك الفرض عليّ وعلى من سمعه إنَّ الله اختار محمدًا من الناس فهداهم به وعلى يديه واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتَّبعوه طائعين أو داخرين لا مخرج لمسلم من ذلك قال وما سكتَ حتى تمنيتُ أن يسكت.

১৫৭. আল-মুহাদ্দিছুল ফাছিল ১/৫৮৫।
১৫৮. আল-জামি লি-আখলাকির রাবী হা/৯৭৪।
১৫৯. আস-সুন্নাহ, মারওয়াযী হা/৯৪।

'আমি তোমাকে রাসূল থেকে হাদীছ শুনাচ্ছি আর তুমি বলছ আমি সেই মত পোষণ করি কিনা? অবশ্যই আমি হাদীছ গ্রহণ করি। আর এটা আমার জন্য ফরয। আর প্রত্যেক যারা হাদীছ শুনবে তাদের জন্য ফরয। নিশ্চয় মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বাছাই করেছেন তার হাতে মানুষকে হিদায়েত দিয়েছেন। তার জিহ্বার মাধ্যমে মানুষের জন্য তাই পছন্দ করেছেন যা তার জন্য পছন্দ করেছেন। সমগ্র দুনিয়াবাসীর জন্য জরুরী তার আনুগত্য করা চাহে অনুগত হয়ে হোক অথবা অপমানিত হয়ে। কোন মুসলিমের তা ব্যতীত গত্যন্তর নেই।[১৬০]

الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ الشَّافِعِيَّ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَمَا تَقُولُ فَارْتَعَدَ وَانْتَفَضَ وَقَالَ أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِذَا رَوَيْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْتُ بِغَيْرِهِ.

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর বিখ্যাত ছাত্র রাবী ইবনে সুলায়মান বলেন, 'একদা একজন ব্যক্তি ইমাম শাফেয়ীকে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করে। হাদীছ শুনানোর পর সে বলে, আপনিও কি এই মত পোষণ করেন। (তার এই কথা শুনে) ইমাম শাফেয়ী ভয় পেয়ে যান এবং কেঁপে উঠেন। তিনি বলেন, 'কোন আসমান আমাকে ছায়া দিবে আর কোন জমিন আমাকে আশ্রয় দিবে যদি রাসূল থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করি আর সেটা ব্যাতীত অন্যটা ফৎওয়া দেই?[১৬১]

তাহক্বীক্ব : বিভিন্ন বইয়ে এ মন্তব্যটি সনদ ছাড়াই উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম ইস্পাহানী (রহঃ) তার হিলয়াতুল আওলিয়া বইয়ে সনদসহ বর্ণনা করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ এ সনদের সকল রাবী মযবূত।

وهذا الإمام مالك رحمه الله حينما جاءه رجل فقال له: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر ... فقال له الإمام: لا تفعل، أحرم من حيث أحرم رسول الله، من ذي الحليفة، إني أخشى عليك الفتنة، فقال الرجل: وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها، فقال مالك رحمه الله: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিকটে একদা এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদে তার কবরের পাশে থেকে ইহরাম বাঁধতে চাই। তখন ইমাম মালেক তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন সেখান থেকে ইহরাম বাধ যেখান থেকে রাসূল (ছাঃ) ইহরাম বেধেছেন! অন্যথায় আমি আশংকা করছি তুমি ফিতনায় পতিত হবে। ব্যক্তিটি বলল, কি ধরণের ফিতনা? আমি তো কয়েক মাইল আরো বেশী করেছি। তখন ইমাম মালেক বলেন, এর চেয়ে বড় ফিতনা

১৬০. মুসনাদ আশ-শাফেয়ী ১/২০।
১৬১. হিলয়াতুল আওলিয়া ৯/১০৬।

আর কি হতে পারে তুমি এমন একটা ফযিলতের কাজ করছ যে ফযিলত পালন করতে আল্লাহর রাসূল ব্যর্থ হয়েছেন।[১৬২]

তাহক্বীক্ব : আলবানী (রহঃ) ইরওয়াউল গালীলে তথ্যসূত্র উল্লেখ ছাড়াই নকল করেছেন। ইমাম মালেকের উক্ত মন্তব্যটি মূলতঃ ইবনুল আরাবী তার আরিযাতুল আহওয়াযী গ্রন্থে সনদসহ নকল করেছেন।[১৬৩] আলহামদুলিল্লাহ! সনদের সকল রাবী মযবূত।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন,
مَا كَتَبْتُ حَدِيْثاً إِلاَّ وَقَدْ عَمِلتُ بِهِ حَتَّى مَرَّ بِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى أَبَا طَيْبَةَ دِيْنَاراً فَأَعطيتُ الحَجَّامَ دِيْنَاراً حِيْنَ احتَجمتُ.

'আমি এমন কোন হাদীছ লিখিনি যার উপর আমি আমল করিনি। এমনকি আমার সামনে দিয়ে একটি হাদীছ পার হল, রাসূল (ছাঃ) হিজামা করেছেন এবং হিজামাকারীকে এক দিনার দিয়েছেন। সাথে সাথে আমি হিজামাকারীর নিকট আসলাম এবং হিজামা করিয়ে হিজামাকারীকে একদিনার দিলাম।[১৬৪]

আবু হানীফা (রহঃ) থেকে সনদসহ বর্ণিত তিনি বলেন,
سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ.

'যদি রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে কোন হাদীছ আসে তাহলে তা চোখ ও মাথার উপর।[১৬৫]

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন,
اشْهَدُوا أَنِّي إِذَا صَحَّ عِنْدِي الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ آخُذْ بِهِ فَإِنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ.

'তোমরা সাক্ষী থাক! যদি আমার নিকট রাসূল থেকে কোন হাদীছ ছহীহ প্রমাণিত হয় আর আমি তা গ্রহণ না করি তাহলে আমার বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে গেছে।[১৬৬]

তাহক্বীক্ব : সনদ ছহীহ

ইমাম আওযাঈ (রহঃ) বলেন,

১৬২. ইরওয়াউল গালীল হা/১০০৩।
১৬৩. আরিযাতুল আহওয়াযী ৪/৩৪।
১৬৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১১/২১৩।
১৬৫. আল-মাদখাল ইলাস-সুনানিল কুবরা, বায়হাকী হা/ ৪০।
১৬৬. আল মাদখাল ইলাস-সুনানিল কুবরা হা/ ২৩৪।

الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِيَّاكَ يَا عَامِرُ أَنْ تَقُولَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُبَلِّغًا عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

'যদি তোমার নিকট রাসূল থেকে কোন হাদীছ পৌঁছে তাহলে তা ব্যতীত অন্য মত গ্রহণ করা থেকে সাবধান! কেননা রাসূল (ছাঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে মুবাল্লিগ ছিলেন।[১৬৭]

তাহক্বীক্ব : সনদ হাসান

ইমাম খুযায়মাহ (রহঃ) বলেন,

لَيْسَ لِأَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلٌ إِذَا صَحَّ الْخَبَرُ عَنْهُ

হাদীছ যদি ছহীহ হয় তাহলে রাসূল (ছাঃ)-এর কথার সাথে কারো কথা চলবে না।[১৬৮]

তাহক্বীক্ব : সনদ হাসান

হাদীছ না মানায় আল্লাহর গযব

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنَّ رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلاَّ الكبر قال ما رفعها إلى فيه.

গালামা আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নিশ্চয় একজন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বাম হাতে খাচ্ছিল। রাসূল তাকে বললেন ডান হাতে খাও! তখন সে বলল আমি পারব না। আর সে এটা অহংকার বশতই এমন কাজ করল। রাবী বলেন তার হাত আর মুখে উঠেনি।[১৬৯]

উপসংহার :

রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তার কোন নির্দেশ অমান্য করা মানে কাফের হয়ে যাওয়া। আজ রাসূল জীবিত নাই কিন্তু তার সেই বাণী অক্ষত আছে। সুতরাং কোন ছহীহ হাদীছ পড়ার পর আমাদের মনে হতে হবে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর মুখ থেকে এই কথা শুনছি তিনি যেন আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাহলে হাদীছের হক্ব আদায় হবে। এই ভাবে হাদীছের অনুসরণেই রয়েছে মুসলিম উম্মাহর নাজাত। রাসূলের নির্দেশ অমান্য করার কারণে যেভাবে ওহুদের যুদ্ধে পরাজয় শিকার করতে হয়েছিল তেমনি আজ রাসূলের নির্দেশ অমান্য করার কারণেই পৃথিবীব্যাপী

১৬৭. আল মাদখাল হা/ ৪৫০; হিলয়াতুল আওলিয়া ৯/১০।
১৬৮. আল মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা হা/২৯।
১৬৯. ছহীহ মুসলিম হা/২০২১।

মুসলমানরা নির্যাতনের শিকার। মহান আল্লাহ সকল মুসলিমকে নিঃশর্তভাবে তাঁর রাসূলের হাদীছের অনুসরণের মাধ্যমে দুনিয়াতে শান্তি ও পরকালে মুক্তি পাওয়ার তাওফিক্ব দান করুন!

Contents

আমরা হাদীছ মানতে বাধ্য

الحديث لا بد منه

নিবরাস প্রকাশনীর অন্যান্য বই সমূহ

- আইনে রাসূল (ছাঃ) দো'আ অধ্যায়
- মরণ একদিন আসবেই
- আদর্শ পুরুষ
- আদর্শ নারী
- আদর্শ পরিবার
- কে বড় লাভবান
- কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত
- বক্তা ও শ্রোতার পরিচয়
- তাফসীর কি মিথ্যা হতে পারে ?
- তাওযীহুল কুরআন (৩০তম)
- তাওযীহুল কুরআন (২৯তম)
- তাওযীহুল কুরআন (২৮তম)
- উপদেশ
- হাদীছ তাহক্বীকে আলবানী (রহঃ)-এর মত পরিবর্তন : সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ও কারণ বিশ্লেষণ
- মুহাম্মাদ (ﷺ)-ই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল
- মুত্তাফাক্বুন আলাইহি হাদীছ শিক্ষায় মণি-মুক্তা উপহার
- সমঅধিকার নয় মর্যাদা চাই
- কেন এই নির্যাতন ? কী তার প্রতিকার ?
- মুমূর্ষু হতে কবর পর্যন্ত

নিবরাস প্রকাশনী